সাহিত্য-সম্পদ গ্রন্থাবলী—১

[বঙ্গভাষার প্রাচীনতম ঐতিহাসিক সঙ্গীত—মাণিকচন্দ্রের গান, ময়নামতার গান ও গোবিন্দচন্দ্র গীতের আখ্যানাংশ]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাভাষার পরীক্ষক, এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক', 'প্রবন্ধ-রত্ন', 'প্রবন্ধ-মুকুল', 'রত্ন-হার', 'রতন-পাঠ', 'চিন্ময়ী', 'সাজের কথা', 'দূর্ব্বা', 'ভারত-কথা', 'বনের কথা', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা ও সম্পাদক

শ্রীশিবরতন মিত্র

সঙ্কলিত

ঢাকা, রিপণলাইব্রেরী হইতে

শ্রীকালীপ্রসন্ন নাথকর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২৬

মূল্য একটাকা চারিআনা মাত্র

কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার-সঙ্কলিত

'সাহিত্য-সম্পদ্ গ্রন্থমালার'

দ্বিতীয় গ্রন্থ

লাউসেন

যন্ত্রস্থ

ঢাকা,—

নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেস হইতে

শ্রীরাধাবল্লভ বসাককর্ত্তৃক মুদ্রিত

বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন

যাঁহার জীবনের অন্যতম মুখ্যব্রত,

যাঁহার অশেষ যত্ন ও চেষ্টার ফলে বঙ্গ-সাহিত্য

বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত তুল্য সম্মান অর্জ্জন

করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে,

বঙ্গভাষার সেই অকৃত্রিম সুহৃদ্

জগদ্বিখ্যাত মনস্বী

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের শ্রীচরণে

'সাহিত্য-সম্পদ্-গ্রন্থমালার' প্রথম গ্রন্থ

অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ

উৎসর্গ হইল

ভূমিকা

আমাদের প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় আশ্রয় করিয়া যুগের পর যুগ ক্রমাগত বহুসংখ্যক সাহিত্য সেবী, মস্তিষ্ক চালনা ও লেখনী ধারণ করিয়া বর্ণিতব্য বিষয়টি সমধিক পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। এই নিমিত্ত, আমরা দেখিতে পাই—শিবায়ন, মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, ধর্ম্ম-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, সত্যনারায়ণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণচরিত, চৈতন্য-চরিত প্রভৃতি বিষয়াবলম্বনে বহুসংখ্যক কবি, বিভিন্ন সময়ে লেখনী ধারণ করিয়া তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে, রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বা নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত যোগসিদ্ধাগণের মাহাত্ম্য-প্রচার বিষয়াবলম্বনে কত কত কবি ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর ধরিয়া গান, গাথা বা সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়টি আশ্রয় করিয়া যে একটি সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই আমরা আপাততঃ বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

যে সকল ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয় আশ্রয় করিয়া সহস্র সহস্র মনস্বী, সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া বিরাট্ বঙ্গসাহিত্য-সৌধ গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার সংখ্যা তত অধিক নহে। কিন্তু, যে বিষয়গুলি অবলম্বনে আমাদের সাহিত্য-সাধকগণ, তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনার ফল প্রচারিত করিয়া, আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্য-সভায় সম্মানিত আসন-প্রাপ্তিকল্পে সহায়তা করিয়াছেন, সেই সেই বিষয়গুলির সহিত আমাদের

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই পরিচিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সকলেই বিশেষজ্ঞের জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া বিরাট্ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া এই মূল বর্ণিতব্য বিষয়গুলি অবগত হইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু অপরের কথা দূরে থাকুক, অন্ততঃ যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের এসকল বিষয়ে একবারে অজ্ঞ থাকা সঙ্গত নহে।

যে কয়েকটি স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া আমাদিগের বঙ্গ-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই বিষয়গুলি সাধারণতঃ আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের **সম্পদ্** বলিয়া মনে করি। সর্ব্বজনবোধ্য সমীচীন ভাষায়, আমাদের এই '**সাহিত্য-সম্পদের** পরিচয় প্রদান করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমরা **সাহিত্য-সম্পদ্-পর্য্যায়**' গ্রন্থাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান "**গোপীচন্দ্র**" আমাদের এই 'সাহিত্য-সম্পদ্-পর্য্যায়ের' প্রথম গ্রন্থ।

এই 'গোপীচন্দ্র' গ্রন্থে, মহারাজ মাণিকচন্দ্র ও রাণী ময়নামতীর পুত্র রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয় অবলম্বনে, শুদ্ধ আমাদের বঙ্গভাষায় নহে, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থকার গান, গাথা, কাব্য বা নাটকাদি রচনা করিয়াছেন—গ্রন্থশেষে 'আলোচনা ও টীকা' অংশে এই উপাখ্যান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে কল্পনার অবাধ ও উদ্দাম গতি এবং ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বা অতিমানুষিক বিষয়ের অসামঞ্জস্যরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়; তথাপি ইহা আমাদের অতি আদরের ধন—অতি যত্নের সামগ্রী—আমাদের গৌরব করিবার স্ব

মানবমাত্রই কল্পনা করে। এই কল্পনার মধ্যেই মানবের আদর্শ-জীবন বা ভবিষ্যতের বিকাশ-পন্থা, তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যদিয়া অভিব্যক্ত হয়। মানবমাত্রই স্ব স্ব জাতীয় জীবনের কল্পনা বা ভাব-ধারার সহিত সংযুক্ত হইয়া হৃদয়ে বল সঞ্চয় করে। সুতরাং, মানব-জীবন গড়িয়া তুলিতে কল্পনা-প্রবণ কবির কাব্য, সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এইজন্য, স্ব স্ব প্রাচীন কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য। মানুষ মানুষকে জানিবে এবং মানুষকে জানিয়া সে আরও বড় মানুষ হইবে—ইহাই সাধনা। এই মানব নানা জাতিতে বিভক্ত এবং এই প্রত্যেক জাতির এক একটি বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টতা, সেই সেই জাতির কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, আচার-ব্যবহার, গার্হস্থ্য-জীবন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেশভূষা, কিংবদন্তী প্রভৃতির মধ্যদিয়া আত্ম-প্রকাশ করে।

পূর্ব্বপুরুষগণের কল্পনা, উত্তরপুরুষগণের রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে বিরাজমান—আমরা শতচেষ্টা করিয়াও তাহা অতিক্রম করিতে পারি না। ফলতঃ, প্রাচীন কাব্যের যাহা প্রাণ, তাহা প্রত্যেক জাতির অন্তঃস্থলে বর্ত্তমান কালেও ক্রিয়া করিতেছে। আমরা অজ্ঞাতসারে তাহারই দ্বারা গঠিত। ব্যক্তি যেমন তাহার শৈশব ভুলিয়া গেলে মনুষ্যত্বই হারাইয়া ফেলে—জীবনে আর কিছু উপভোগ্য থাকে না—যাবতীয় রসভোগের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ কোন জাতি, তাহার প্রাচীন কবিগণের কল্পনার আনন্দ-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত বা বঞ্চিত হইলে, কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় আনন্দহীন অবস্থায় দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত প্রাচীন

কাব্য-ধারার সহিত সকলেরই জীবনের প্রারম্ভকাল হইতে হৃদ্‌গত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

কল্পনা, ভাব-জীবনের অভিব্যক্তি। আমাদের 'ভবিষ্য-আমি' বা 'আদর্শ-আমি' কল্পনার মধ্যদিয়াই পরিব্যক্ত হয়। পূর্ব্বপুরুষগণ সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক জাতির জীবনের যে গতি ও প্রসার নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, তাহার সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এই পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে, প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত কাব্যনিচয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা অজ্ঞাতসারে, সেই সমস্ত কল্পনা বর্ত্তমান সাহিত্যের মধ্যদিয়াও প্রাপ্ত হই। এই নিমিত্ত সাহিত্যের সত্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য—চিরন্তন সত্য হিসাবে সেইজন্য সাহিত্যের সত্য অতি উচ্চস্থানের অধিকারী বলিয়া কথিত।

মানুষ কল্পনা করিয়াছে—করিতেছে ও করিবে। আত্মপ্রসারণের চেষ্টাদ্বারা কল্পনা পরিব্যক্ত হয়। মানুষ যখন স্ব স্ব জাতীয় জীবনের অতীত কল্পনা-রাজ্যের সমীপস্থ হয়, তখন তাহারা তাহাদের বাস্তব জীবনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রত্যেক জাতির জীবন ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বিশিষ্টতার সহিত পরিচয় সংস্থাপনই আমাদের সাহিত্য-সাধনার চিরন্তন প্রয়াস। অপ্রত্যক্ষ শক্তি, যোগবল, তপস্যা, সংযম, আধ্যাত্মিক ক্রিয়া, মন্ত্র-শক্তি প্রভৃতি দ্বারাই আমাদের সভ্যতার বিশিষ্টতা আমাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়াছে।

শুদ্ধ আমাদের কেন? বিশ্বের কোন্ সাহিত্যে কল্পনার

উদ্দাম গতি, পৌরাণিক ও অতিমানুষিক কল্পনার সংমিশ্রণে পুষ্টি লাভ করে নাই?—বিশ্বের কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থ, অতিমানুষিক কল্পনায় ছত্রে ছত্রে পুষ্টিলাভ করে নাই? আমাদের বালকগণ—Legends of Greece and Rome, Arabian Nights, Fairy Tales, Folk Tales বা Folk Lore এবং এবংবিধ অন্যান্য অতিমানুষিক গল্প বা উপকথাপূর্ণ ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিবে—কিন্তু আমাদের যাহা নিজস্ব, যাহা আমাদের রক্তমাংসের সহিত মজ্জায় মজ্জায় জড়িত—এক কথায়, যাহা আমাদের প্রাণ—আমাদের বালকগণকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখা সঙ্গত মনে করি না। এতদুদ্দেশ্য সাধন জন্যই আমরা বর্ত্তমান 'সাহিত্য-সম্পদ্'-পর্য্যায়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিলাম। উচ্চাধিকারিগণ মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার রসাস্বাদন করিবেন। ছাত্রগণ যেমন Lamb's Tales পাঠ করিয়া পরবর্ত্তী কালে Shakespear-রচিত মূল নাটকাবলী পাঠে অগ্রসর হইবার জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখে, আমাদের প্রাচীন-সাহিত্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বে, আমাদের এই পর্য্যায়-ভুক্ত গ্রন্থাবলী বালকগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে, তদ্রূপ উপযুক্ত ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবাল-কীটের দ্বীপ সংগঠনের ন্যায় এক একটা নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আখ্যান আশ্রয় করিয়া বহু শিক্ষিত ও নিরক্ষর কবি, বহু শত বর্ষ ধরিয়া নব নব কল্পনা সংযোগে তাহা অপূর্ব্ব নবভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা সাহিত্য-সম্পদ্-পর্য্যায়-ভুক্ত গ্রন্থে, তাঁহাদের মূল আশ্রয়ীভূত উপাখ্যান; অবিকৃতভাবে সর্ব্বজনবোধ্য সমীচীন ভাষায়

প্রকাশিত করিব। তাঁহাদের আখ্যান, তাঁহাদের উপমা, এমন কি সুবিধা হইলে, তাঁহাদের ভাষার সাহায্যে বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা আমাদের 'নিজস্ব' কল্পনা বিন্দুমাত্রও সংযোগ করিয়া প্রাচীনত্বের পবিত্রতায় হস্তক্ষেপ করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিব না। অনিবার্য্য জ্ঞানে, দুর্ব্বোধ্য স্থানের বোধসৌকর্য্যার্থ কোন কোন স্থানে গ্রন্থবর্ণিত বিষয় কথঞ্চিৎ বিশদ করিয়াছি মাত্র। সুতরাং, কল্পনার সহিত কল্পনা-মিশ্রণের এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে গিয়া বিশেষ সংযম অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তথাপি অজ্ঞাতসারে যে কোথাও পদস্খলন হয় নাই, এরূপ বলিতে পারি না। সর্ববিষয়াবলম্বনে রচিত এযাবৎ প্রকাশিত প্রায় যাবতীয় পুস্তক সম্মুখে রাখিয়া, আখ্যানাংশ সঙ্কলন করিয়াছি—ইহাতে সমবেতভাবে বহু প্রাচীন কবির কল্পনার সহিত সমষ্টিভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিবে। তবে, অনেকস্থলে, বহু কবির অবলম্বিত সমগ্র আখ্যানাংশগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হওয়া যে কঠিন, এমন কি অনেকস্থলে অসম্ভব, তাহা প্রাচীন-সাহিত্য-সেবিমাত্রেই অবগত আছেন।

এই "গোপীচন্দ্র" গ্রন্থের আখ্যানাংশ সঙ্কলন করিতে যে যে পুস্তক বা প্রবন্ধ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, গ্রন্থশেষে তাহার একটা সম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল। এইরূপ সন্ধান-গ্রন্থের তালিকা, বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনাকারিগণের সহায়তা করিতে পারে।

প্রায় দশবৎসর যাবৎ "সাহিত্য-সম্পদ্-গ্রন্থমালা" রচনা করিতে প্রতিশ্রুত বা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম—সুযোগ ও সুবিধার অভাবে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশ-বিষয়ে

আমার স্নেহশীল সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-মহাশয় আমায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন—তাঁহার উৎসাহ না পাইলে, অল্পকাল মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইত না। বর্ত্তমান সময়ে কাগজ অগ্নিমূল্য—এই সময়ে নবরচিত পুস্তক এরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন নাথ মহাশয় আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই পর্য্যায়ের পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলিও তিনি তুল্যরূপ উৎসাহের সহিত প্রকাশিত করিবেন।

এক্ষণে, এই গ্রন্থখানি যাহাদের জন্য রচিত, তাহাদের উপযোগী বিবেচিত হইলে ধন্য ও চরিতার্থ হইব। ইতি—

বীরভূম,
৭ই আষাঢ়, ১৩২৬

শ্রীশিবরতন মিত্র

পরিচয়

গাথা-পরিচয়

আমাদের 'গোপীচন্দ্র' গ্রন্থের আখ্যানাংশ মূলতঃ—(১) 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', (২) 'ময়নামতীর গান' এবং (৩) 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

গাথার প্রকার-ভেদ

(১)—'মাণিকচন্দ্র রাজার গান'—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক্ সোসাইটির জারন্যালে (১ম ভাগ, ৩য় খণ্ড) স্বনামখ্যাত ডাক্তার জি, এ, গ্রিয়ারসন্ কর্ত্তৃক দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। এই গাথা বা গানটি, রঙ্গপুর-অঞ্চলে প্রচলিত; ডাক্তার গ্রিয়ারসন্ কোন যুগি-জাতীয় বৃদ্ধের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া সংগ্রহ করেন। এ গাথাটি, সদাশয় সুহৃদ্ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গাথাটি 'ময়নামতীর গানের' একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণমাত্র।

(২)—'ময়নামতীর গান'—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহাশয়, রঙ্গপুর জেলার সবডিভিসন্ নীলফামারী হইতে, দুইটি বৃদ্ধ যুগীর আবৃত্তি অনুসারে, দুইটি সুবৃহৎ পাঠ সংগ্রহ করিয়াছেন—ইহার মধ্যে একটি গাথায় 'লোচনদাস'-নামক এক কবির ভনিতা দৃষ্ট হয়। এই দুইটি পাঠ ব্যতীত, তিনি অপর এক যুগীর নিকট হইতে একটি আংশিক পাঠ সংগ্রহ করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বর বাবু, তাঁহার

সংগৃহীত পাঠ অবলম্বন করিয়া ১৩১৫ সালের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' (২য়-সংখ্যা—৬৫-৯৯ পৃঃ) 'ময়নামতীর গান'-শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে, 'ময়নামতীর গানের' আলোচ্য বিষয়ের বিশদ পরিচয় প্রদান করিয়া, গীতোক্ত ব্যক্তিগণের ঐতিহাসিকতা এবং স্থানসমূহের ভৌগোলিক সংস্থানবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। নাথ-সম্প্রদায়ের কাণ্ফাড়া যুগিগণ প্রায়ই নিরক্ষর—তাহারা আবহমানকাল, মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়াই পুরুষপরম্পরা এই গাথাটি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বিশ্বেশ্বর বাবু বলেন,—'ময়নামতীর প্রাচীন গান কোথাও পুঁথিতে লিপি-বদ্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। রঙ্গপুরের কাণ্ফাড়া যুগীরা মুখে মুখে ইহা অভ্যাস করে এবং আসরে বা ভিক্ষার সময় গোপীযন্ত্রের সাহায্যে, নিজ নিজ শক্তি অনুসারে, উহারা শ্রোতার মনস্তুষ্টি জন্মাইতে চেষ্টা করে। বৃহৎ গানের সকল অংশ সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না; সুতরাং, গায়কের সামর্থ্য, রুচি বা প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পালার সৃষ্টি হইয়াছে। কোথাও বা গানের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ বা পরিচ্ছেদ মাত্র গীত হয়, কোথাও বা শাখা প্রশাখা কর্ত্তন করিয়া মূল বৃক্ষের কাণ্ডটি স্থির রাখিয়া যথাসম্ভব একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীয়ারসন্ সাহেবের গানটী শেষোক্ত শ্রেণীর। দুর্ল্লভ মল্লিকের গান কেবল সংক্ষিপ্ত নহে, ইহাতে স্থূল ঘটনা-বলীরও সম্পূর্ণ উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে, মূল গানও যে অনেক স্থলে অপরের শাখা-পল্লবে আবৃত হইয়া পুষ্টকলেবরে পল্লীগ্রামের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ'; অন্যত্র—'কে এই বঙ্গীয় গাথার আদি রচয়িতা তাহা স্থির করা অসম্ভব—সম্ভবতঃ কোন যোগী। রঙ্গপুরের যোগি-সম্প্রদায় এখন অন্যান্য স্থানের যোগী হইতে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুত্বের স্থূল আবরণ দ্বারা প্রাচীন বৌদ্ধমত প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহাদের আচারব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপ সেই ভাবের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করিতে পারে নাই। এখনও

ধর্ম্ম তাহাদের উপাস্য দেবতা; গোরকনাথ, ধীরনাথ, ছায়ানাথ, রঘুনাথ প্রভৃতি উপদেবতা বা স্মরণীয় মহাপুরুষ।' বীশ্বেশ্বর বাবু, তাঁহার সংগৃহীত সুবৃহৎ গাথাটি এখনও প্রকাশিত করেন নাই। গ্রীয়ারসন্ সাহেব বা বীশ্বেশ্বর বাবুর সংগৃহীত গাথায় কোন নির্দ্দিষ্ট রচয়িতার নাম নাই—উহা বহুকাল ধরিয়া অসংখ্য কবির ভাবপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে।

(২—ক) 'ময়নামতীর গান'—কবি ভবানীদাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহোদয়গণের সম্পাদকতায় ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদকদ্বয় অনুমান করেন, কবি ভবানীদাস, অনুমান তিন কি সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে কুমিল্লা অঞ্চলে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান'ও গীত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল। তিনি লোকমুখে প্রচলিত আখ্যান বা যুগিগণের সঙ্গীত ধৃত উপাখ্যান অবলম্বনে স্বতন্ত্র গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন।

(৩) 'গোবিন্দচন্দ্র গীত'—দুর্ল্লভ মল্লিক-রচিত এবং শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত। এই গ্রন্থখানি, প্রাচীন গানের অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণ। গ্রন্থকার "শিল্পব্যবসায়ী ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগীর শিষ্য ছিলেন—এই নিমিত্ত তাঁহার 'গীত', আদ্যন্ত বৌদ্ধভাবচিহ্নিত; সুতরাং ভাষা ভিন্ন ইহাতে আর কিছু পরিবর্ত্তিত হয় নাই, স্বীকার করিতেই হইবে" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৭৫ পৃঃ)।

(৩—ক) ময়ূরভঞ্জ হইতে প্রাপ্ত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' —এই গাথায় বহু উড়িয়া শব্দ মিশ্রিত আছে; 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে আংশিকভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত, আমাদের মাতৃভাষানুরাগী বহুতর মহোদয়ে সমবেত বা ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে, আমাদের আলোচ্য বা তদনুরূপ বিষয়াবলম্বনে আরও কতকগুলি প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থ, সম্প্রতি লোক-

লোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঢাকা-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—(১) 'মীনচেতন' এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'গোরক্ষ-বিজয়' নামক গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গাথার উদ্দেশ্য

'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', 'ময়নামতীর গান' 'গোবিন্দচন্দ্র গীত'—এই সকল গাথা, রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-অবলম্বনে রচিত হইলেও, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে হাড়িফা বা জলন্ধরী হাড়িসিদ্ধার অভিশপ্ত অবস্থায় মেহারকুল বা পাটিকায় অবস্থান এবং অভিশপান্তে তাঁহার শিষ্য কাণুফা কর্ত্তৃক উদ্ধার এবং প্রসঙ্গক্রমে গুরু গোরক্ষনাথের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে 'মীনচেতন' বা 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে, অভিশপ্ত মীনচেতনের কদলীপাটনে অবস্থিতি এবং তাঁহার শিষ্য গুরু গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধারবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। 'কাণুফা এবং গাবুর সিদ্ধার পতন ও পুনরুত্থানের কাহিনী লইয়া, বোধ হয়, এই পালা সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু এই দুই অংশ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মীননাথ ও হাড়িফার কাহিনীর জনপ্রিয়তায় অপর দুইজন সিদ্ধার কাহিনী অন্ধকারে পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাই, এইগুলি লুপ্ত হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে' (ভূমিকা, 'মীনচেতন', ঢাকা পরিষৎ)। বহুতর 'ধর্ম্মমঙ্গল' গ্রন্থেও মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা, কাণ্ফা প্রভৃতি সিদ্ধাগণের কাহিনী বর্ণিত আছে। "নবম, দশম এবং একাদশ খৃষ্ট শতাব্দে বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষের সহিত শৈবধর্ম্মমূলক যোগ ও তন্ত্রাচার মিশ্রিত হইয়া 'নাথ-পন্থের' সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মীননাথ, গোরক্ষনাথ ইত্যাদি এই পন্থা-প্রবর্ত্তকগণের অগ্রণী—ইহার বেশী, বর্ত্তমানে জোর করিয়া বলা নিরাপদ্ নহে" ('মীনচেতন'—ভূমিকা)।

গাথা-বর্ণিত বিষয়ের প্রসার

এই নাথ-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত গাথাগুলি সর্ব্বাগ্রে বঙ্গভাষায় রচিত—ক্রমে ইহা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-বিষয় অবলম্বনে হিন্দী, উড়িয়া, উর্দ্দু, নাগরী, গুজরাতী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায়

কত কত কাব্য, নাটক, ছড়া, গান, গাথা, গল্প প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। *

রঙ্গপুর বা তন্নিকটবর্ত্তীস্থলে মাণিকচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র গোপীচন্দ্রের আবাসবাটী এবং এই অঞ্চলের 'নাথ-পন্থ' যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ, এই গীত গাহিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই গান বঙ্গভাষায় রচিত হইলেও, ইহা এতদিন সমগ্র বাঙ্গালা মধ্যে তাদৃশ প্রচার লাভ করে নাই। যে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনে সমগ্র ভারতবর্ষে স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল, গোপীচন্দ্রের জন্মভূমি এবং 'তাহার সন্ন্যাস অবলম্বনে সর্ব্বাগ্রে যে দেশের ভাষায় গাথা রচিত হইয়াছিল, সেই বঙ্গদেশে, নির্দ্দিষ্ট সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাহিরে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বড় কেহ সংবাদ রাখিত না। তথাপি, এতকাল ধরিয়া ইহা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে, তিনজন বিশেষজ্ঞ মহোদয়গণের অভিমত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উদ্ধৃত হইল—

(১) "এই গীতে নানারূপ ভীষণ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা আছে, তাহা আমরা আরব্য উপন্যাসের ন্যায় পাঠ করিয়াছি।

গাথার স্থায়িত্বের হেতু

অনুবাদ গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও কবিকঙ্কণ 'চণ্ডী' হইতে ভারতের 'অন্নদামঙ্গল' পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কোন্ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই? সেই সব ঘটনা হইতে মাণিকচাঁদের গীতে-বর্ণিত ঘটনা ভিন্নরূপ। সেগুলির পশ্চাতে দেব-শক্তি, তাই সেগুলি

* 'বোম্বাই ও পুণায় বাঙ্গালা রাজা গোপীচাঁদের ছবি বিক্রীত হইয়া থাকে। কাশী, ফয়জাবাদ, আহামদনগর, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে গোপীচাঁদ রাজার নাটক অভিনীত হইয়া থাকে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গোপীচাঁদের গল্প কহিয়া অথবা তাহার জীবনের ঘটনা-বিশেষের গান গাহিয়া শত সহস্র লোক ভিক্ষা করিয়া থাকে। বহু ভাষায় বহু পুস্তকে গোপীচাঁদের অদ্ভুত জন্ম, বনবাস, রাজত্ব, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন, বিবাহ......মাতার সহিত মনোমালিন্য প্রভৃতি ঘটনাবলী লইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ বিরচিত হইয়া গিয়াছে। সকল দেশেই ইহাঁকে বঙ্গের প্রধান রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ বঙ্গদেশে এই রাজার নাম কেহ শুনে নাই'
—(ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী—'বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ')।

হিন্দুর নিজস্ব বলিয়া পরিচিত—আর ইহার পশ্চাতে শুধু মন্ত্রশক্তি * * বৌদ্ধ জগতের এই সঙ্গীত বোধ হয় এতদিন লুপ্ত হইয়া যাইত ; কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতে দেবদেবীর কথা সংযোজিত হওয়াতে, ঐ গীত ঈষৎ পরিমাণে হিন্দুত্বের আভা ধারণ করিয়াছে এবং সেই হিন্দুত্বের আভাটুকুই বোধ হয় এই গানের পরমায়ু-বৃদ্ধির কারণ'—('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন পৃঃ ৭২-৭৩)।

(২) 'গানের পরমায়ু-বৃদ্ধির অপর কারণ এই যে, ইহা বহুকাল হইতে সম্প্রদায়বিশেষের উপজীবিকাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে এবং যে সমাজে ইহা প্রচলিত, সে সমাজ এখনও সংস্কৃত ও হিন্দুত্বের গণ্ডী দ্বারা আপনাকে পাচীনতর সমাজ হইতে সম্যগ্রূপে স্বতন্ত্র করিতে পারে নাই' —(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—'ময়নামতীর গান')। এবং

(৩) "অনতিবৃহৎ জনপদের অধিপতি গোপীচাঁদের গাথার এরূপ জনপ্রিয়তা ও ভারতব্যাপিত্বের কারণ কি ? কারণ অনেক গুলি—গোপীচাঁদ অত্যন্ত রূপবান্ ছিলেন—গোপীচাঁদের গাথায় অনেক স্থানেই তাহার পরিচয় আছে। গোপীচাঁদ পিতামাতার একমাত্র সন্তান—বিস্তীর্ণ রাজ্যের উত্তরাধিকারী—পরাক্রান্ত রাজগণের কন্যাগণের স্বামী। এইরূপে একটি ভাগ্যবান্ যুবকের নবীন যৌবনের অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজ্যধন সুখসম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়ার মত করুণ ঘটনা জগতে বড় বেশী ঘটে নাই—ভারতবর্ষে গোপীচাঁদের পূর্ব্বে ও পরে মাত্র এক একবার ঘটিয়াছিল। বিশ বৎসর বয়সে নবজাত পুত্র ছাড়িয়া সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসে বাহির হইলেন—'আজিও জুড়িয়া, অর্দ্ধ জগত, ভক্তিপ্রণত চরণে তাঁর'। গোপীচাঁদের পঞ্চশত বৎসর পরে, নবদ্বীপ আঁধার করিয়া নবপরিণীতা পত্নী পরিত্যাগ করিয়া—মায়ের বুকে শেল হানিয়া আর এক নিষ্ঠুর, এইরূপে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন—সমস্ত ভারতময় একটা অসীম করুণরসের উচ্ছ্বাস বহিয়া গিয়াছিল—বাঙ্গালা দেশ এখনও সেই রসধারায় সরস হইয়া রহিয়াছে। কাজেই গোপীচাঁদের করুণ কাহিনী

যে ভারতবর্ষের হৃদয়কে কাড়িয়া লইবে, ইহাতে অসাধারণ কিছুই নাই। দ্বাদশ বৎসরের সন্ন্যাসে গোপীচাঁদ ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই লোকের মন গলাইয়া আসিয়াছেন এবং বিগলিতহৃদয় জনসমূহ গোপীচাঁদের করুণ কাহিনীকে পুরুষপরম্পরায় উত্তরাধিকারের মত রাখিয়া গিয়াছে"।—('ময়নামতীর গান'—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী)।

দ্বিতীয় সন্ন্যাস

পরিশিষ্টে বর্ণিত দ্বিতীয় সন্ন্যাসের কথা, একমাত্র 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, গোপীচন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—সন্দিগ্ধ ব্রাহ্মণের অভিশাপ সত্য হইয়াছে (১৮পৃঃ)। ভবানীদাসও তাঁহার 'ময়নামতীর গানে' বলিয়াছেন—'গোপীচাঁদের বংশ নাই ভুবন জুড়িয়া' (পৃঃ ১৬)। মতান্তরে—'ভবচন্দ্র (নামান্তর উদয়চন্দ্র) এই বংশের শেষ-রাজা। বিবেচনা হয়, উদয়চন্দ্র উদয়নার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল'—('গোবিন্দচন্দ্র গীত'—টীকা ১৩৪ পৃঃ) 'ভবচন্দ্র রাজা তার গবচন্দ্র মন্ত্রী' —এই প্রবাদের ভবচন্দ্র' (ঐ, ॥৶০)।

গাথার বিশেষত্ব

"রামায়ণ ও মহাভারত, পল্লীগ্রামে খাঁটী হিন্দুর নিকট যতদূর সত্য, ময়নামতীর গাথাও যোগীদিগের এবং তাহাদিগের বহুসংখ্যক শ্রোতার নিকট ততদূর সত্য। বঙ্গভাষার সেবকের নিকট ইহাতে বিবিধ আবর্জ্জনা মধ্যে পুরাবৃত্ত আছে, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব আলোচনার নূতন উপদেশ আছে। ময়নামতীর গাথা মার্জ্জিত কবির পাণ্ডিত্যশূন্য হইলেও, একবারে কবিত্বশূন্য নহে। ইহাতে প্রসাদ গুণ আছে, শ্লেষ আছে, অনেক স্থলেই মানবপ্রকৃতির প্রকৃত আলেখ্য আছে। অতি-প্রাকৃত ঘটনার অতিরিক্ত সমাবেশ সত্ত্বেও কবিতা দেবীর অঙ্গসৌরভ দূরীভূত হয় নাই। মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী, গোপীচন্দ্র ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এক সময়ে যে, তাঁহারা রক্তমাংসের শরীরে আমাদেরই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন, তাহা নিশ্চিত। নীল-ফামারী মহকুমার অন্তর্গত ডিমলা থানার অধীন হরিণচড়া ও আটিয়াবাড়ী

গ্রামে এখনও 'ময়নামতীর কোট' বা বাসস্থানের নিদর্শন বর্ত্তমান। বোধ হয়, ঐ স্থানকেই ফেরুসানগর বলিত"—(পঃ পঃ ১৩১৫, ৮৯ পৃঃ)।

এই ময়নামতীর গাথায় বর্ণিত রাজা মাণিকচন্দ্র, ও গোপীচন্দ্রের আবাসস্থান রঙ্গপুর অঞ্চলে বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি, একজন লেখক 'গৃহস্থ' পত্রিকায় নানারূপ যুক্তি তর্ক দ্বারা ত্রিপুরা জেলার মধ্যে গাথা-বর্ণিত স্থানসমূহের নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কেহ, চট্টগ্রাম অথবা পূর্ব্বাঞ্চলে, ঐ স্থান-সমূহের অবস্থান সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন। ('ভারতবর্ষ')

ভৌগোলিক সংস্থান।

রাজা গোপীচন্দ্র, পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল,—এই তিন রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতামহ, মেহারকুল বা পাটিকারার রাজা তিলকচাঁদের একমাত্র কন্যা ময়নামতী এবং তাঁহার শ্বশুর, সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের অদুনা ও পদুনা নাম্নী দুই কন্যা। কিন্তু 'গোবিন্দচন্দ্র গীতে' অদুনা বলিতেছেন— 'মোর পিতৃদেশে চল আছে সাত ভাই। সেইদেশে যমরাজা না যায় সদাই' (পৃঃ ৭৭)। ইহারা সম্ভবতঃ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র নহে, জ্ঞাতি-পুত্র। গোপীচন্দ্র, গাথার বহুস্থলে—'বঙ্গের-ঈশ্বর', 'বঙ্গের মহিপাল' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, 'বঙ্গ' শব্দে 'পূর্ব্ববঙ্গ' সূচিত হইয়াছে।

গোপীচন্দ্র

রাজা গোপীচন্দ্র, অনুমান দশম খৃষ্টাব্দের শেষাংশ বা একাদশ খৃষ্টাব্দের প্রথমাংশে বর্ত্তমান ছিলেন—এবং মূল ময়নামতীর গাথাটী সম্ভবতঃ, এই দশম শতাব্দী বা তৎসন্নিহিত কালের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে।

গোপীচন্দ্র ও গাথার কাল

শব্দ-পরিচয়

পৃঃ ২ বাড়ী—বৃদ্ধি ; 'ধান্য দিয়া না লইবে বাড়ী'—কঃ কঃ চণ্ডী।

পৃঃ ১ { সতি—সৎপ্রকৃতি।

পৃঃ ২ { অ-সতি—অসৎপ্রকৃতি।

পৃঃ ৬ ছন্—জঙ্গলময়।

৬ তাপতে—উৎপীড়নে।

পৃঃ ১০ অভিচার—অন্যের অনিষ্ট অভিসন্ধিতে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত প্রণালী-সম্মত ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান। ইহা ষড়্‌বিধ, যথা—মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন এবং বশীকরণ।

পৃঃ ১২ আই—(সং, আর্য্যা) মাতা।

পৃঃ ১৩ ফাঁপর—হতজ্ঞান বা হতবুদ্ধি ; নিরুপায়, হতাশ।

পৃঃ ১৫, ৫৮ সিদ্ধা—যোগসিদ্ধ: অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য ঈশিত্ব, বশিত্ব, ও কামবাসিতা—এই অষ্ট সিদ্ধি যিনি লাভ করিয়াছেন।

পৃঃ ১৬,১৫৫ আড়াই অক্ষরী—গায়ত্রীর বীজমন্ত্র।

পৃঃ ২৮ বাহড়ে—(সং-ব্যাবৃৎ) প্রত্যাবৃত্ত হওয়া—'পথ বাহুড়িয়া মুনি দেখিবারে পায়' ('শূনা-পুরাণ'।)

পৃঃ ২৯,১৮২,১৯৪ চৌদ্দতাল—তাল = অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলি-মিত পরিমাণ।

পৃঃ ২৯ আসন—উপবেশন প্রণালী বিশেষ। আসন পঞ্চবিধ—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন।

পৃঃ ৩৩ ধুগ্‌ড়ী—মোটা সূতার বস্ত্র বা তদ্দ্বারা নির্ম্মিত কন্থা ; চটের মত মোটা সূতার শীতবস্ত্রবিশেষ।

পৃঃ ৩৪ গোলা কবুতর—যে পায়রা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। (ধান্যাদি

রক্ষার জন্য বৃহৎ মরাইর চাল হইতে বিলম্বিত আশ্রয়মধ্যে যে কবুতর বাস করে)।

পৃঃ ৩৫ পাঞ্জা—বিস্তৃত করতল ; একাপাঞ্জায় যতগুলি খড় একবারে ধৃত করা যায়।

পৃঃ ৪২ বড়—খড়ের মোটা দড়ী ; 'খড় বেড়িয়া পাকাইলে বড় হয়' 'দাঁতে খড়, গলায় বড়, চুণকালি কপালে' (মাণিক গাঙ্গুলির 'ধর্ম্ম মঙ্গল')।

পৃঃ ৫৭ বাউল—বাতুল।

পৃঃ ৬০ জালন্ধরী—'হাড়িফা অর্থাৎ সিদ্ধ বালপাদ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের নিকট বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন, তদনন্তর পবিত্র সম্প্রদায়ের ভিক্ষু হইয়া উদ্যানে (বর্ত্তমান, স্বাট ও চিত্রল) গমন করিয়া সেখানে যোগাভ্যাস করেন, সেথান হইতে তিনি প্রস্তর ও জলমধ্য হইতে উদ্গত জলদগ্নিশিখ জালন্ধরে গমন করেন। সেখানে দীর্ঘকাল বাস নিবন্ধন তিনি জালন্ধরের সিদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। জলংধরি, দ্বাদশ মার্গ প্রবর্ত্তকের অন্যতম মার্গ প্রবর্ত্তক। ('গোবিন্দচন্দ্র গীত'—২৭ টীকা)।

পৃঃ ৬১ এড়িমু—রাখিয়া যাইব, এড়ি—রাখি, ত্যাগ করি, বা ছাড়ি।

পৃঃ ৬১ বাইস দণ্ডের রাজা—২২-দণ্ড সময় মধ্যে যত পরিমাণ স্থান অতিক্রম করা যায়, তত পরিমাণ বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। বলা বাহুল্য, 'বঙ্গের মহীপাল' রাজা গোপীচন্দ্র, এতদপেক্ষা বহুবিস্তৃত ভূমির অধীশ্বর ছিলেন।

পৃঃ ৬২ সাহেবানী বা সাহেমানী দোলা—'সাহেব' অর্থাৎ ভদ্রলোকের ব্যবহারের উপযুক্ত দোলা।

পৃঃ ৭৮ সুন্দীবেত—অত্যন্ত সরু বেত্রবিশেষ।

পৃঃ ৭০ জাদ—চুল বান্ধিবার জড়োয়া দড়ী।

পৃঃ ৭১ নিরঞ্জন—যাঁহার অন্তরে অঞ্জন অর্থাৎ মল নাই (ধর্ম্ম বা বুদ্ধের নামান্তর)।

পৃঃ ৭৮ পায়্যা—পাইয়া।

পৃঃ ৯২ কানাথ—পরদা (কাণ্ডার); তাঁবুর বস্ত্রনির্ম্মিত প্রাচীর।

পৃঃ ৯৫ কৈরে—করিয়া।

পৃঃ ৯৬ পরখিয়া—পরীক্ষা করিয়া।

পৃঃ ১০১ সাইঙ্গ—ভারী দ্রব্য দুই চারি জনে কাঁধে ঝুলাইয়া লইবার বাঁশ বা দণ্ড। 'বুকে তুলেদিন পাঁচ সাঙ্গের পাতর'—কঃ কঃ চণ্ডী। 'ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল রাশি', চৈঃ—চ।

পৃঃ ১০৩ ধড়—(পা অবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত শরীর); শরীর বা দেহ।

পৃঃ ১০৬ নেতের কাপড়—সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র। 'সোণার কলসী নিল নেতের বসন'—'শূন্য-পুরাণ'।

পৃঃ ১০৮ তিন কোণ পৃথিবী—প্রাচীন গ্রাম্য কবির ভ্রান্ত ধারণা।

পৃঃ ১১৫ সাচা—সত্য (সাচ্চা)।

পৃঃ ১১৮ সাধু—উপাধি বিশেষ।

পৃঃ ১২২ জতু বা জৌ লাক্ষা; মহাভারতের জতুগৃহ-দাহ লোক-প্রসিদ্ধ।

পৃঃ ১২৮ বৈঠা—নৌকার ছোট দাঁড় বা কেরাল।

পৃঃ ১৩১ ডাঙ্গর—শ্রেষ্ঠ, বড়; 'আমা হতে কোনজন আছয়ে ডাঙ্গর' (মঃ)।

পৃঃ ১৩১ নফর—চাকর।

পৃঃ ১৩২ সাত পাঁচা—৭হাত দীর্ঘ, ৫ হাত প্রস্থ।

পৃঃ ১৩৫ ঊনশত—এক-ঊন-শত; ৯৯।

পৃঃ ১৪১ গম্ভীরা—মন্দির বা গৃহের মধ্যভাগ।

পৃঃ ১৪৯ ভূসঙ্গ—ভস্ম।

পৃঃ ১৫৩ পাষণ্ড—বৌদ্ধ ক্ষপণকাদি, অথবা নাস্তিক বা সদাচার-ভ্রষ্ট ব্যক্তি।

পৃঃ ১৫৪ ধড়া—কটীবস্ত্র বা চিরবস্ত্র (ধটী)।

পৃঃ ১৫৭ জল-টুঙ্গী—জলাশয়ে নির্ম্মিত উচ্চ গোলাকার গৃহ।

পৃঃ ১৬২ গড়—ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম।

পৃঃ ১৬৬ গোড়ায়—চলে।

পৃঃ ১৬৭ গঞ্জিকা—ভবানীদাসের 'ময়নামতী' পুস্তকে, সুরা বা 'মদ' সেবনের কথা আছে।

পৃঃ ১৮৮ কাঞ্জী—কনিষ্ঠাঙ্গুলী।

পৃঃ ১৮৮ উরাত—উরুদেশ।

পৃঃ ১৯১ গোসাঞী—গে-স্বামী বা ভূ-স্বামী=রাজা।

পৃঃ ১৯৩ চিড়িমার—ব্যাধ ; যে চিড়িয়া বা পাখী বধ করে।

পৃঃ ১৯৩ আঠাকাঠি—পাখী ধরিবার জন্য বটবৃক্ষের ক্ষীর সংযুক্ত কাঠি ও সূতা।

সাতনলা—সাতটি পৃথক্ পৃথক্ নল সংযুক্ত করিয়া যে সুবৃহৎ দণ্ড প্রস্তুত হয়।

পৃঃ ১৯৪ উধাও—উর্দ্ধে ধাবন। 'উধাও করিল ঘোড়া অন্তরীক্ষ পথে (মাণিক গাঃ—'ধর্ম্মমঙ্গল')।

পৃঃ ১৯৭ আসা-নড়ী—আসা=দণ্ড বা যষ্টি।

পৃঃ ২০০ বুল্‌বুল্ পক্ষী—ভবানীদাসের 'ময়নামতী' পুস্তকে আছে—

'বাদুড় হইয়া রহ ভুবন ভিতরে'॥
'দিনেতে উপাস কর রাত্রিতে ভক্ষণ'॥
'দিবসে উল্‌টা হইয়া টাঙ্গনে রহিবা।
যে মুখে খাইবা তুমি সে মুখে বরশিবা।'

পৃঃ { ২০২ / ২০৩ / ২০৫ } পুটি—পুট = পত্রাদি রচিত পাত্রবিশেষ।

পৃঃ ২০৮ সাহেবাণী—রাণী (ভদ্র-মহিলা), (রাণি = গৃহপত্নী)

পৃঃ ২০৮ উঞ্ছ—উঞ্ছবৃত্তির লোক ; উঞ্ছ—জীবিকার্থ ধান্য খুঁটিয়া সংগ্রহ করা।

পৃঃ ২১৯ বার—দর্শন দিবার জন্য সাভায় উপবেশন।

'রত্নসিংহাসনে বার দিল যুগপতি'—'শূন্য-পুরাণ'

'বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ ভূপাল'—কঃ কঃ চণ্ডী।

সন্ধান-গ্রন্থাদির তালিকা

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তক প্রণয়ন-কল্পে নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও পত্রিকাদির প্রবন্ধ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি :—

পুস্তক

১। 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' (Calcutta University—Compiled by Rai Sahet Dines Chandra Sen, B. A.) গ্রন্থে—(ক) ১৮৭৮ সালের J. A. S. B পত্রের প্রথম ভাগ ৩ নং, ১৮১ পৃঃ, ডাঃ গ্রিয়ারসন্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'মাণিকচন্দ্র রাজার গানের অংশ'—পৃঃ ২৭—৮৪ ; (খ) ময়ুরভঞ্জ হইতে প্রাপ্ত 'গোবিন্দচন্দ্র গীতের' অংশ এবং (গ) নীলফামারী হইতে সংগৃহীত 'ময়নামতীর গানের' অংশ।

২। 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' (দুর্লভ মল্লিক কৃত)—শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত।

৩। 'ময়নামতীর গান' (ভবানীদাস-কৃত)—ঢাকা পরিষৎ।

৪। 'মীনচেতন'—(শ্যামাদাস-কৃত) ঐ

৫। 'গোরক্ষ-বিজয়' (সেখ ফয়জুল্লা-কৃত)—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

৬। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ,

৭। History of Bengali Language & Literature—ঐ

৮। 'বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজ-বংশ'—ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

৯। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'—১৩১৫।২।৬৫-৯৯ শ্রীবীশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ লিখিত 'ময়নামতীর গান' ; ঐ ৪র্থ—কার্য্য-বিঃ ৩৩—৩৪ পৃঃ ; ঐ—১৯ ধর্ম্মপালের গড় ১১—১৭ পৃঃ।

১০। 'প্রতিভা'—(ঢাকা পরিষৎ) ২।৭ ; ২।১১—৬১৭-২৭ পৃঃ, ৩।৩ ; ৩।১২—৩৯৭ পৃঃ. ৪।২—৯৪ পৃঃ।

১১। 'মানসী'—৫—১১৭ পৃঃ ('ময়নামতীর পুথি')।

১২ 'প্রবাসী'—১৩১৬—৪১৭ পৃঃ ; ১৩১৭—২৯৮ পৃঃ, ১৩১৯—আষাঢ়

১৩। 'ভারতী'—১৩১৭। অগ্রহায়ণ ও চৈত্র।

১৪। 'গৃহস্থ'—৫।২—৬৪৫-৬৬২ পৃঃ ও ৭৬৭-৭৮৩ পৃঃ।

১৫। 'ভারতবর্ষ'—১।১—৫৪০ পৃঃ।

১৬। 'সাহিত্য-সংবাদ'—(হাওড়া)—১৩২৪।

১৭। 'প্রাচীন পুথি'—'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ' (মুন্সী আব্দুল করিম-সম্পাদিত)

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড—পূর্ব্ব কথা

মাণিকচন্দ্র ও ময়নামতী

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিধা

ময়নামতী ও গোপীচন্দ্র

তৃতীয় খণ্ড—সঙ্কল্প

ময়নামতীর পরীক্ষা গোপীচন্দ্রের সঙ্কল্প

চতুর্থ খণ্ড—সন্ন্যাস

হাড়িফা ও গোপীচন্দ্র

পঞ্চম খণ্ড—প্রত্যাবর্ত্তন

গোপীচন্দ্র ও হাড়িফা

পরিশিষ্ট—দ্বিতীয় সন্ন্যাস

টীকা—

গোপীচন্দ্র

প্রথম খণ্ড—পূর্ব্ব কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

—'মাণিকচন্দ্র রাজা বঙ্গে বড় সতি।'

রাজা মাণিকচন্দ্র—প্রজাগণের অবস্থা

প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের এই বঙ্গদেশে, মাণিকচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি মহারাজ স্থবর্ণচন্দ্রের পৌত্র এবং মহারাজ ধাড়িচন্দ্রের পুত্র।

মহারাজ মাণিকচন্দ্রের দেহ যেরূপ সুশ্রী ও সুন্দর, তাঁহার অন্তঃকরণ ততোহধিক উচ্চ ও মহৎ। তাঁহার ন্যায় সৎ ও প্রজাবৎসল নৃপতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রজাবর্গকে তিনি আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাহারা তাঁহার আশ্রয়ে পরমসুখে কালযাপন করিত। ফলতঃ, তাঁহার রাজত্বকালে, প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধির অবধি ছিল না।

প্রজার সুখে রাজার সুখ—প্রজার ঐশ্বর্য্যে রাজার ঐশ্বর্য্য—রাজা মাণিকচন্দ্র,একথা প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি প্রজাদিগকে সুখী করিতে এবং নিজে সুখী হইতে পারিয়াছিলেন। প্রজাদিগের অবস্থা সমৃদ্ধ করিয়া তিনি স্বীয় বৈভব অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কৃষক-প্রজা, একহালের পরিমাণ ভূমি কর্ষণ করিয়া মাসিক "দেড় বুড়ী কড়ি" মাত্র কর প্রদান করিত। প্রতি মাসে কর প্রদানের রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, প্রজাগণ যথাকালে দেয় কর পরিশোধ করিতে কষ্ট অনুভব করিত না। সেই সময়ে এক তঙ্কা বা মুদ্রার মূল্য 'চৌদ্দ বুড়ী' বা সাড়ে তিন আনা মাত্র ছিল। যে কৃষক দশ তঙ্কার 'বাড়ী খাইত' বা ঋণ গ্রহণ করিত, সে এই ঋণ পরিশোধকালে, মাত্র দেড় বুড়ী অতিরিক্ত দিয়াই নিষ্কৃতি পাইত। ফলতঃ, জলোকাভাবাপন্ন কুশীদজীবিগণ, প্রজাগণের পরিশ্রমলব্ধ ফল শোষণ করিয়া তাহাদিগকে চিরদারিদ্র্যের মধ্যে নিমগ্ন রাখিতে পারিত না।

মহারাজ মাণিকচন্দ্র, অবশ্য-কর্ত্তব্য-বোধে, তাঁহার রাজ্য মধ্যে, গ্রামে গ্রামে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন ও 'জাঙ্গাল' বা শরণি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রজাগণও নিশ্চিন্ত

ছিল না—প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্বীয় স্বীয় পুষ্করিণী খনন করাইত। কেন না, একে অপরের পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করা অতি অপমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিত। এমন কি, একে অপরের অধিকৃত ভূমিতে বিচরণ করিতেও দারুণ লজ্জাবোধ করিত।

প্রজাগণের সমৃদ্ধির বা ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব ? গ্রাম্যবালকগণ পর্য্যন্তও সুবর্ণ-গোলক লইয়া সাধারণ ক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করিত—এই সুবর্ণ-গোলক আবার কোন-রূপে হারাইয়া গেলে, তাহার অনুসন্ধান জন্য সময়ক্ষেপণ করা তাহারা নিতান্ত অনাবশ্যক বিবেচনা করিত। স্বর্ণ রৌপ্যের ছড়াছড়ি !—কেন একে অপরের দ্রব্য অপহরণ করিবে ? লোকের ঘরে ঘরে হীরা-মণি-মাণিক্যই বা কত ! বংশ-নির্ম্মিত পাটীতে করিয়া গৃহস্থগণ সময় সময় সে গুলি রৌদ্রে মেলিয়া দিয়া শুষ্ক করিয়া লইত !

সে কালে সকলেই ধনী ছিল। গৃহস্থ-বধূগণ সুবর্ণ-মণ্ডিত সাড়ী পরিধান করিত—সুবর্ণের কলসীতে জলপান করিত। কেবলমাত্র বিধবাগণ রৌপ্যকলসী ব্যবহার করিত। এমত অবস্থায় কে ছোট, কে বড়—কে রাজা, কে প্রজা—সহজে নির্দ্দেশ করা কঠিন হইত !

যে ব্যক্তি মজুরের কার্য্য করিয়া দিনপাত করে, সেও

মস্তকে রঙিন-ছত্র ব্যবহার করে—কার্য্যকালে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিবার জন্য সোণার পিড়া বা আসন সঙ্গে লইয়া যায়। দুই প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ছয় 'তঙ্কা' উপার্জ্জন করে—দিবসের অবশিষ্টকাল প্রান্তরে বা ময়দানে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণপূর্ব্বক স্ফূর্ত্তিতে অতিবাহন করে। আবার, প্রতিদিন মজুরীও করিতে হয় না—একদিন মজুরী করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই দুই তিন দিন বসিয়া খায়।

যাহারা নিতান্তই দরিদ্র, যাহারা ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারাও পদব্রজে বা নগ্নদেহে গমন করে না। তাহারা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় তেজস্বী অশ্বে আরোহণ এবং দিব্য বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ফলতঃ, এমন লোক নাই, যাহার দ্বারে অশ্ব আবদ্ধ রহে না।

যে সকল দরিদ্র প্রজা, স্ত্রী-পুরুষে জঙ্গলে পত্র আহরণ করিয়া জীবিকার সংস্থান করে, তাহারাও কালে হস্তী ক্রয় করিবার কল্পনা একবারেই আকাশ-কুসুম মনে করে না। যাহারা স্ত্রী-পুরুষে জ্বালানী কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া দিনপাত করে, তাহারাও কোন দিন সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিবার আশা পোষণ করিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ মনে করে না!

এই প্রকারে, রাজা প্রজা উভয়েরই বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে

দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু চিরকাল কি সমান যায়? কুসুমে কীট প্রবেশ করিল—মাণিকচন্দ্রের এমন রামরাজত্বেও অতর্কিতভাবে দুষ্টের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় প্রজাগণের সুখশান্তি তিরোহিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'নাঙ্গল বেচায় জোঙাল বেচায় আর বেচায় ফাল ;
খাজনার তাপতে বেচায় দুধের ছাওয়াল ॥'
'রাড়ী কাঙ্গাল দুঃখীর বড় দুঃখ হইল ।
খানে খানে তালুক সব ছন্ হইয়া গেল ॥'

প্রজাগণের ভাগ্য-বিপর্য্যয়—প্রতিকার-চেষ্টা

রাজ্য সুশাসনকল্পে, যে সকল বিষয়ে রাজার বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণদর্শিতা আবশ্যক, তন্মধ্যে মন্ত্রি-নির্ব্বাচন সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রীর দোষে, রাজার সাধু সঙ্কল্পনিচয় কার্য্যে পরিণত হইতে পায় না। মন্ত্রীর কুচক্রে ও কুপরামর্শে রাজার সরল মন বক্র হইয়া যায়, তরল হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠে।

প্রজাগণের—শুধু প্রজাগণের কেন, রাজা মাণিকচন্দ্রেরও ভাগ্যদোষে, তাঁহার রাজ্য-পরিচালনায় সহায়তা করিবার জন্য একজন দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট দক্ষিণবঙ্গ-নিবাসী অসৎ ও হীন প্রকৃতির মন্ত্রী বা দেওয়ান নিযুক্ত হইল। এই দুষ্ট মন্ত্রী কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, রাজ্যের যাবতীয় প্রজা অতি সামান্যমাত্র কর প্রদান করিয়া বহুপরিমাণ ভূমি ভোগ করে। সুতরাং, এই কর দ্বিগুণ কেন, বহুগুণ বর্দ্ধিত করিলেও, সমৃদ্ধ প্রজাগণের সেই বর্দ্ধিত হারে কর প্রদান

করিতে অসুবিধা বা আপত্তি হইবে না—এই ভাবিয়া সে প্রজাগণের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কর, আপাততঃ দ্বিগুণিত করিয়া দিল—দেড় বুড়ী খাজনা, পনর গণ্ডায় পরিণত হইল !

কিন্তু মন্ত্রী যাহা মনে করিয়াছিল, তাহা হইল না। এই করবৃদ্ধির ফল, রাজা-প্রজা উভয়েরই পক্ষে অতি অমঙ্গলকর ও বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। গরীব দুঃখীকে কষ্ট দিয়া নানারূপে নিপীড়িত করিয়া, রাজভাণ্ডারে অর্থসঞ্চয় করিবার ফলে, অচিরেই কত তালুক জঙ্গলময় বা জনশূন্য হইয়া গেল ! অতিরিক্ত খাজনার দায়ে, সাধু সওদাগরদিগকে তাহাদের জীবিকার্জ্জনের উপায় নৌকা বিক্রয় করিতে হইল। এমন কি, দরবেশ-ফকিরকে পর্য্যন্ত তাহাদের ভিক্ষার সম্বল ঝুলিকাঁথা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইল। ফলতঃ, এই দ্বিগুণিত কর যোগাইতে অনেক প্রজাকেই, তাহাদের চাষের সামগ্রী—হাতিয়ার, ফাল-লাঙ্গল, জোয়াল গরু এবং এমন কি, দুগ্ধ-পোষ্য শিশু পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইল ! দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল—পুত্র-শোকাতুরা জননীর কাতর ক্রন্দনে নিরীহ প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিল। রাজা, যখন প্রজাগণের এই অশেষ কষ্ট ও নির্য্যাতন দেখিয়াও দেখিতেছেন না,—পরন্তু, হিংসা-পরায়ণ হীনপ্রকৃতি মন্ত্রীর যাবতীয় অসৎকার্য্যের প্রশ্রয়

দান করিতেছেন, তখন প্রজাগণ দাঁড়াইবে কোথায় ? তাহারা একবারে হতাশ হইয়া পড়িল—তাহারা এখন সকলেই সমবেতভাবে চরমপন্থা নির্দ্ধারণে কায়মনঃপ্রাণে ব্রতী হইল। প্রতিগ্রামে একজন বয়োজ্ঞানবৃদ্ধ মণ্ডল বা প্রধান থাকিত। প্রজাগণ সকলেই সমবেত হইয়া তাহার বাটীতে উপস্থিত হইল এবং কি করিলে, রাজার অমানুষিক অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন আশু নিবারিত হইবে, তদ্বিষয়ে তাহার যুক্তি ও উপদেশ প্রার্থনা করিল।

প্রধান বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, সমবেত প্রজামণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"দেখ, বিষয়টি অতিশয় জটিল; এই আসন্ন ও ভয়ঙ্কর বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার আশু উপায় আমি কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। চল, বরং আমরা ভোলামহেশ্বর শিবঠাকুরের শরণাপন্ন হই—তিনিই আমাদিগকে এই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন। আমরা তাঁহারই আজ্ঞা ও নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিব।"

প্রধানের উপদেশানুসারে সমবেত প্রজামণ্ডলী, শিবঠাকুরের দ্বারসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারদেশে বিপুল জনসংঘের কোলাহল শ্রবণ করিয়া শিবঠাকুর বাটীর বহির্দ্দেশে পদার্পণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র,প্রজাগণ গলবস্ত্র ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

শিবঠাকুর তাহাদিগকে অগ্রেই আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—'ধর্ম্ম তোমাদিগকে বর দান করুন। তোমরা বাঁচিয়া থাক—সমুদ্র-সৈকতে যত বালুকা আছে, তত বৎসর তোমাদের পরমায়ু হউক। তোমরা এ অসময়ে আমার নিকটে কি জন্য আগমন করিয়াছ ?'

প্রজাগণ করজোড়ে বলিল—'দেবাদিদেব, আমাদের প্রতিপালক মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পূর্ব্ব স্বভাব আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি এখন নিতান্তই অসৎপ্রকৃতি হইয়াছেন—তাঁহার অত্যাচারে আমরা সকলেই অতিমাত্রায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছি—আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করুন।

প্রজাগণের এই নিদারুণ দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভোলা-মহেশ্বরের কোমল-হৃদয় বিচলিত হইল—তিনি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'তোমরা চিন্তিত হইও না—মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে—আর মাত্র ছয়মাস কাল পরে, তাঁহার মানবলীলা শেষ হইয়া যাইবে। আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিতেছি—আমি তোমাদিগকে মাণিকচন্দ্রের পরমায়ু বিষয়ে যে কথা বলিলাম—দেখিও, ইহা যেন তাঁহার পত্নী ময়নামতীর কর্ণগোচর না

হয়। সে সামান্যা নারী নহে—এ সংবাদ জানিতে পারিলে, সে আমার এই কৈলাসভবন লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিবে।'

প্রজাগণ, শিবঠাকুরের এই নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বলিল—'আপনার একথা যদি প্রকাশিত হয়, তবে আমরা এক সত্য, দুই সত্য—তিন সত্য করিয়া বলিতেছি—আমরা মহাপাপগ্রস্ত হইয়া এই সুদুর্লভ মানবজীবন পরিত্যাগ করিব'।

ভোলা-মহেশ্বরের উপদেশ মত প্রজাগণ, ধর্ম্মঠাকুরের পূজার আয়োজন করিল। তাহারা সকলেই রবিবার দিবস নিরম্বু উপবাসী রহিয়া কলসীপূর্ণ ধূপসিন্দুর, পিঞ্জরপূর্ণ হংস ও পারাবত এবং ধবল ছাগ বংশদণ্ডে ঝুলাইয়া লইয়া পারণী-গঙ্গা বা তীস্তানদীর তীরে ধর্ম্ম-পূজার 'স্থান' প্রস্তুত করিল। তদনন্তর যথারীতি ধর্ম্মপূজা হইলে পর, ধবল ছাগ বলিত হইল, হংস ও পারাবতগুলি নদীর ঘাটে উৎসর্গীকৃত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং ধূপসিন্দুর প্রজ্বালিত করা হইল। সর্ব্বশেষে, অস্ফুটন্ত বেণা-গুল্ম বালুকার মধ্যে প্রোথিত করা হইল। প্রজাগণের এইরূপ অভিচারের ফলে এবং ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের বরে, মহারাজ মাণিকচন্দ্রের আয়ুনাশ হইল।

রবিবার দিবস পূজা সমাধা হইল—পর দিবস অর্থাৎ

সোমবার হইতে মহারাজ মাণিকচন্দ্র 'অবিরাম জ্বরে' আক্রান্ত হইলেন—মঙ্গলবারেই মহারাজ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন এবং বুধবার সর্ব্ববিধ ভক্ষ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে, মহারাজ মাণিকচন্দ্রের দীর্ঘ পরমায়ু ছয়মাসে পরিণত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'বাপ মায়ে নাম থুইল শিশুমতি আই।
গোর্ক্ষনাথ নাম থুইল সোন্দর মৈনাই॥'

ময়নামতী—বাল্য-কথা—দীক্ষা—বিবাহ

মেহারকুল বা পাটিকারার রাজা তিলকচান্দের সন্তানের মধ্যে মাত্র এক কন্যা—নাম শিশুমতি। শৈশবকালে একদিন শিশুমতি তাহার সখীগণের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে রন্ধন করিতেছিল। সেই সময়ে গুরু গোরক্ষনাথ, ষোলশত যোগী অনুচর সহ শূন্যপথে রথারোহণে গমন করিতেছিলেন। গুরু গোরক্ষনাথ, একটি সতী-কন্যার অনুসন্ধানে, এইভাবে দেশে দেশে আকাশমার্গে দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন—কিন্তু এ যাবৎ কৃতকার্য্য হন নাই। আজ হঠাৎ এই ভাবে শিশুমতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তিনি মহা-নন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং আকাশ হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন।

গুরু গোরক্ষনাথ, শিঙ্গায় ফুৎকার দিয়া শিশুমতির নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আমরা আজ দ্বাদশ বৎসর কাল অনাহারে আকাশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি—রাজ-কন্যা, তুমি আজ আমাদিগকে ভিক্ষা দান এবং উদরপূর্ণ

করিয়া আহার প্রদান কর।' গোরক্ষনাথের কাতর প্রার্থনায় বালিকার কোমল হৃদয় বিগলিত হইল—সে তৎক্ষণাৎ ভিক্ষা আনিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

এদিকে গোরক্ষনাথ মায়াপ্রভাবে রাজভাণ্ডারের যাবতীয় দ্রব্য উড়াইয়া দিলেন—শিশুমতি সমুদায় ভাণ্ডার-গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সামান্যমাত্র ভক্ষ্য দ্রব্যেরও সন্ধান পাইল না। রাজকোষে স্বর্ণ রৌপ্য মণিমুক্তার অনুসন্ধানে গিয়া সেখানেও দেখিল, রাজকোষ শূন্য—একবারে কপর্দ্দকশূন্য! শিশুমতি যে দিকে যায়, গোরক্ষ-নাথের মায়ায় সবই শূন্য হইয়া যায়—শিশুমতি মহা ফাঁপরে পড়িয়া কাঁদিয়া আকুল হইল।

অবশেষে, অন্তঃপুরের এক নিভৃত গৃহ-কোণে একমুষ্টি তণ্ডুলের সন্ধান প্রাপ্ত হইল। শিশুমতি তাড়াতাড়ি তখন সমুদ্রে স্নান করিয়া 'আ-পোড়া' মৃণ্ময় পাত্রে রন্ধন করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিল এবং ঘৃত ও দুগ্ধ সংযোগে সেই অন্ন সুবর্ণ থালায় চাঁপা কলা সহ সুসজ্জিত করিয়া গোরক্ষনাথের সমক্ষে নিবেদন করিয়া প্রণাম করিল।

এত মায়া এত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, এত মায়া, এত ছলনার মধ্যে এত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বালিকা শিশুমতি সুবর্ণথালায় ঘৃত দুগ্ধ সহ অন্ন গোরক্ষনাথের

সমক্ষে এত ভক্তিভরে নিবেদন করিয়া দিল—তথাপি সে অন্ন গ্রহণে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। শিশুমতি সতী কি অসতী কন্যা—ইহার বিশেষরূপ প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া তিনি এই নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিবেন না।

এতদুদ্দেশে গোরক্ষনাথ, মায়াকে শিশুমতির নবনীত-কোমল বালিকা-দেহে দ্বাদশ সূর্য্যের তাপ দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। দ্বাদশ আদিত্যের অনলবর্ষী প্রখর তাপে শিশুমতির কোমল দেহ হইতে প্রবল ধারায় ঘর্ম্ম-প্রবাহ নির্গত হইয়া তাহার পদতল বাহিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না—পরন্তু, সেই প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে গোরক্ষনাথের কষ্টানুভব হইবে ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তকোপরি রঙ্গিন ছত্র ধারণ করিল।

শিশুমতির দ্বাদশ আদিত্যের বিশ্বদাহা প্রচণ্ড তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা এবং অতিথির প্রতি অচলা ভক্তি দেখিয়া গোরক্ষনাথ সাতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে তাহার নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর ভাবিলেন,—'আহা, এমন গুণবতী সতী কন্যা যদি কখন যমের কবলে পতিত হয়, তবে আমার এতকাল ধরিয়া কঠোর সাধনা বৃথাই হইল! আমি এই মেহারকুল সহরের নাম চিরস্থায়ী করিয়া যাইব। আমাদের

সিদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের প্রভাব এই মেহারকুলেই প্রথম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ; কিন্তু ইহার পূর্ণ প্রভাবের স্থান বিক্রমপুর সহর। সুতরাং, শিশুমতিকে ভিক্ষা দান করিয়া যমের কবল হইতে চিরতরে রক্ষা করিতে হইলে সেই বিক্রমপুরের সিদ্ধস্থানে লইয়া যাওয়া আবশ্যক'।

মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা উদিত হইবা মাত্রই,গোরক্ষনাথ শিশুমতিকে রথে তুলিয়া বিদ্যুদ্বেগে একবারে বিক্রমপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে নদী-সঙ্গমে যোগি-ঘাটে শিশুমতিকে স্নান করাইয়া, তাহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট করিয়া দিলেন। সেই সময়ে তথায় একটি বট-বীজ গোরক্ষ-নাথের হস্তগত হইলে, তিনি তাহা অদূরে নিক্ষেপ করিবামাত্র দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে এক বিশাল বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে সেই বৃক্ষতলে বার কোটী যোগী ও তের কোটী 'চেলার' সমাগম হইল। এক চাউলের ভাত রান্ধিয়া উনকোটী সিদ্ধায় ভক্ষণ করিল এবং এক সিদ্ধার পরিমাণ অবশিষ্ট রহিল—সিদ্ধা সেই অন্ন খাইয়া অভুক্ত গোরক্ষনাথের জয় গান করিতে লাগিল।

তদনন্তর গুরু গোরক্ষনাথ, শিশুমতির মস্তক স্পর্শ করিয়া—'অন্দি-সন্ধি', 'অনাদি-তত্ত্ব', 'ব্রহ্ম-জ্ঞান', 'মহাজ্ঞান' প্রভৃতি নানারূপ জ্ঞান প্রদান করিলেন এবং সর্ব্বশেষে

'আড়াই-অক্ষরী' মহাজ্ঞান কর্ণমূলে ধীরে ধীরে কহিয়া দিলেন। মহামন্ত্র ও মহাজ্ঞান দানের পর যমরাজকে ডাকাইয়া শিশুমতির নাম, তাহার তালিকা হইতে একবারে উঠাইয়া দিবার আদেশ প্রদান করিলেন—শিশুমতি চারিযুগ অমর হইলেন। এখন হইতে শিশুমতির দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না—কিংবা লৌহাস্ত্রে বিদ্ধ হইবে না। গুরু গোরক্ষ-নাথ যোগি-সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'শিশুমতি যদি দিবসে মরে, তবে সূর্য্যকে বাঁধিয়া রাখিব—রাত্রিতে মরিলে চন্দ্রের গতি রোধ করিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিব—খাঁড়া দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইলে, খাণ্ডাধারিণী স্বয়ং চণ্ডিকাকেই বাঁধিয়া রাখিব। যদি আপন গৃহে মরে, স্বয়ং যমরাজকে বাঁধিয়া আনিব—সে আমার কবল হইতে পলায়ন করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কোথাও নিষ্কৃতি পাইবে না। আমি শিশুমতিকে 'ব্রহ্মজ্ঞান' দান করিলাম—তোমরা সকলেই শিশু সুন্দরীকে আশীর্ব্বাদ প্রদান কর। শিশুমতি যে অপূর্ব্ব শক্তি লাভ করিল, তাহার প্রভাবে সে চারিযুগ অমর হইল। এতদ্ব্যতীত সে চতুর্দ্দশযুগ শূন্যের উপর, ত্রয়োদশযুগ জলের ভিতর, এবং দ্বাদশযুগ অগ্নির ভিতর অনায়াসে অবস্থাম করিতে সমর্থা হইবে। যখন সৃষ্টি সংহৃত হইয়া রসাতলে যাইবে,সমস্ত পৃথিবী যখন জলময় হইয়া যাইবে

—এই ধরণীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—এমন কি, আকাশে চন্দ্র,সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—তখনও শিশুমতির মৃত্যু হইবে না—শিশুমতি জলে বটপত্রশায়ী নারায়ণের ন্যায় ভাসিতে থাকিবে।'

এই বলিয়া গুরু গোরক্ষনাথ শিশুমতিকে মহাদীক্ষা দান করিলেন এবং তাহাকে পিতৃগৃহে যথাস্থানে রাখিয়া পূর্ব্ববৎ অপর সকলের অজ্ঞাতসারে আকাশমার্গে চলিয়া গেলেন। এখন হইতে পিতৃদত্ত নামের পরিবর্ত্তে শিশুমতি —ময়নামতী নামেই অভিহিত হইতে লাগিল।

রাজা তিলকচান্দ, তাঁহার এই একমাত্র আদরের বিদুষী কন্যার সহিত রাজা মাণিকচন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজা মাণিকচন্দ্র, তিলকচন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধবশতঃ স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরগৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনতিকাল মধ্যেই ময়নামতী, তান্ত্রিক সাধনায় অসাধারণ সিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করিলেন। মাণিকচন্দ্র কিন্তু এ সকল বিষয়ে একবারে অপ্রবিষ্ট—তিনি স্ত্রীর আচারব্যবহারে অসন্তুষ্ট এবং মন্ত্রতন্ত্রের অবিরাম সাধনার জন্য মনে মনে শঙ্কিত হইলেন। বিশেষতঃ অসিদ্ধ দেহ লইয়া, পিতৃগৃহে অবস্থিতা, প্রবলা রাক্ষসী বা ডাইনীর ন্যায় সিদ্ধা স্ত্রীর সহবাসে

শ্বশুরগৃহে বাস করা তাঁহার পক্ষে ক্রমে দুরূহ হইয়া উঠিল। এই নিমিত্ত তিনি সময়ক্রমে দেবপুরের পাঁচ কন্যা বিবাহ করিলেন। পরে তাঁহার ভার্য্যার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া নয় বুড়ী বা একশত আশিতে পরিণত হইয়াছিল।

এদিকে ময়নামতী মাণিকচন্দ্রকে, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার সাধনা-লব্ধ ও গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত 'আড়াই-অক্ষরী' জ্ঞান লইয়া অমরত্ব অর্জ্জন করিবার জন্য প্রতি-নিয়তই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কেন না, এই মহাজ্ঞান একবার লাভ করিলে, সমস্ত পৃথিবী যদি উলট্-পালট্ হইয়া রসাতলে ডুবিয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহাকে যমালয়ে যাইতে হইবে না। কিন্তু মাণিকচন্দ্র, তাঁহার পত্নীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। গুরু-জ্ঞানে আপনার পত্নীর পদধূলি কোন প্রাণে গ্রহণ করিবে?—ইহাও কি কখন সম্ভব হয়! তিনি স্পষ্টই বলিলেন—'আমি আমার পত্নীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে চাহি না। তোমার যে জ্ঞান আছে, ভবিষ্যতে তোমার যদি পুত্র হয়, তবে তুমি তাহাকে তোমার এই জ্ঞান প্রদান করিও'—এই বলিয়া তিনি ময়নামতীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশবর্ষ

অতীত হইয়া গেল। সপত্নীগণের সহিত ময়নামতীর নিত্য কলহে মাণিকচন্দ্র নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন অগত্যা, ময়নামতীর সহিত তাহাদের স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং তাহাদিগকে লইয়া অদূরস্থিত তাঁহার স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পরম সুখশান্তিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার নবনিযুক্ত দক্ষিণ দেশবাসী নায়েব বা মন্ত্রী তাঁহার রাজ্যময় চতুর্দ্দিকে মহা অশান্তির বীজ ছড়াইয়া নিরীহ প্রজাবৃন্দকে যার পর নাই উত্যক্ত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিল—তাহাদের সুখের সংসারে আগুন জ্বালাইয়া দিল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—"অসতি হইল রাজা রাজ্যের ভিতর।
সেই রাজাকে লৈয়া আইস যমালয়ের ভিতর॥"
'শূন্ত পথে আসি যম প্রাণ নিল কেড়্যা।
প্রাণ পুরুষ ছেড়্যা গেল কায়া রইল পড়্যা।'

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু

ছয়মাস পূর্ণ হইয়া গেল—মহারাজ মাণিকচন্দ্রের পরমায়ু শেষ হইল।

চিরনির্ম্মম যমরাজও মহারাজ মাণিকচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর সময় সমাগতপ্রায় জানিয়া শোকান্বিত হইলেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন?—তাঁহাকে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতেই হইবে। এই নিমিত্ত তিনি গোদা-যম ও অন্যান্য সাতজন দূতকে ডাকিয়া বিষণ্ণবদনে এই কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন—'দেখ, মহারাজ মাণিকচন্দ্রের স্বভাব এখন বড়ই অসৎ হইয়াছে, তাঁহাকে হাতে-গলায় বান্ধিয়া অবিলম্বে আমার নিকটে আনয়ন কর'।

যমরাজের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, গোদা-যম অনুচরগণসহ চর্ম্ম-রজ্জু ও লৌহ-দণ্ড হস্তে ঘুরিতে ঘুরিতে মহারাজ মাণিকচন্দ্রের বাড়ীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহারাজ মাণিকচন্দ্র, আজ ছয়মাসকাল রোগশয্যায় শায়িত—কিন্তু ময়নামতী স্বামীর ব্যবহারে মর্ম্ম-পীড়িতা হইয়া দারুণ অভিমান বশতঃ তাঁহার কোন সংবাদ লন নাই। এখন, মাণিকচন্দ্র, তাঁহার পাত্র হেমাই বা নেঙ্গাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'তুমি এই দণ্ডেই ময়নামতীর নিকটে গিয়া বলিয়া আইস যে, আমি আজ ছয়মাসকাল অতি রুগ্ণ অবস্থায় শয্যাগত আছি—এবং তাহাকে দেখিবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি—সে যেন আদৌ কালবিলম্ব না করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে।'

নেঙ্গা তড়িৎ-গতিতে ময়নামতীর আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। ময়নামতী সদর দরজায় বসিয়া পাশা খেলিতেছিলেন। এই নিমিত্ত নেঙ্গা খিড়কী দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া ময়নামতীর চরণে প্রণাম করিল। ময়নামতী ব্যগ্র হইয়া তাহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল—'মা, সংবাদ আর কি বলিব ?—আমাদের মহারাজ মাণিকচন্দ্র আজ ছয়মাসকাল মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছেন। আপনি এখনই চলুন—রাজরাজেশ্বর মাণিকচন্দ্র আপনাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন।'

মহারাজ মাণিকচন্দ্রের এই মারাত্মক রোগের সংবাদ পাইবামাত্রই ময়নামতী ধ্যানস্থা হইলেন এবং দিব্য-নেত্রে যমের

সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অপরের অগোচরে যাবতীয় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তখন ময়নামতী, কাটারী বা জাঁতী দিয়া 'বাঙ্গালা-গুয়া' দুইখান করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন, 'মিঠা'-পানে চূণ-লেপন দিয়া সুপারীসহ খিলি প্রস্তুত করিলেন এবং সেই এক খিলি পানের মধ্যে ষোল-খিলির পরিমাণ জ্ঞান অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া সেই পান বাটায় আবদ্ধ করিলেন। পানের বাটা দাসীর মস্তকে দিয়া স্বয়ং ধবল বস্ত্র পরিধান করিয়া ও হস্তে হেন্তালের লাঠি লইয়া বায়ুর সঞ্চারে তদ্দণ্ডেই যাত্রা করিলেন এবং অনতিবিলম্বে মহারাজ মাণিকচন্দ্রের অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ ছয় মাসের রোগী—ময়নাসুন্দরী এতদিন তাঁহার কোন সংবাদ লন নাই। এখন উপস্থিত হইয়া মাণিকচন্দ্রকে, তাহাকে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন—'মহারাজ, পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি আমার নিকট যে জ্ঞান আছে, তাহা গ্রহণ করুন। আমার সেই জ্ঞানের প্রভাবে আমা অপেক্ষা অধিক বয়সের বৃক্ষ মরিয়া যাইবে—কিন্তু আপনার কখনও মৃত্যু হইবে না। পরন্তু পূর্ণ যৌবন লাভ করিয়া আমরা উভয়েই চিরকাল পরম সুখে বাঁচিয়া থাকিব।'

মহারাজ মাণিকচন্দ্র কিন্তু এখনও পূর্ব্ববৎ অটল—অন্তিম-

শয্যায় মৃত্যুর আহ্বান তাঁহার কর্ণমূলে নিয়ত ধ্বনিত হইতে রহিলেও, অমরত্ব লাভের আশা, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিল না। তিনি ময়নামতীর প্রস্তাবিত 'মহাজ্ঞান' প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—'মহারাজ মাণিকচন্দ্রকে এখনই যমে লইয়া যাউক, ক্ষতি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে কখনও তাহার স্ত্রীর নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিবে না —মহারাজ মাণিকচন্দ্র জীবন থাকিতে কখনও পত্নীকে 'গুরু-মা' বলিয়া সম্বোধন বা তদ্রূপ ভক্তি করিতে পারিবে না'।

মহারাজ মাণিকচন্দ্র আপন পত্নীর নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করিয়া অমরত্ব অর্জ্জন করিতে চাহিলেন না। ময়নামতী তখন মহারাজের শয়নকক্ষের চারিকোণে চারিটি দীপ দিবারাত্র জ্বালাইয়া রাখিলেন এবং স্বয়ং অশ্ব-শালায় নির্জ্জনে ধ্যানমগ্না হইয়া উপযুক্ত ঔষধ বা মহারাজের প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে মহারাজ মাণিকচন্দ্রের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু স্বয়ং ময়নামতী রাজ-বাটীতে উপস্থিত রহিয়াছেন—যমদূতগণ সাহস করিয়া রাজ-বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তাহারা যতবারই প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল, ময়নারাণী ততবারই তাহার

জ্ঞানের তেজে রাজবাড়ী হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিতেছেন। ময়নামতী একবার চণ্ডীকালীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক 'তৈলপাটের খাঁড়া' লইয়া মার-মার শব্দে তাহাদিগকে অনেকদূর পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া আসিলেন।

যমরাজের আদেশ, আজই মাণিকচন্দ্রের প্রাণ লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে হইবে—এদিকে ময়নামতীর জ্ঞানের অসীম ক্ষমতাপ্রভাবে, তাহারা ঈপ্সিত কর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না! তখন তাহারা সকলেই একত্র হইয়া পরামর্শ করিল—ময়নামতীকে, যে কোন উপায়েই হউক না কেন, ক্ষণেকের জন্য স্থানান্তরিত করিতে হইবে। এইজন্য, যমদূতগণের মধ্যে একজন মূষিকরূপ ধারণ করিয়া কূপের সমগ্র জল একবারে শোষণ করিয়া লইল; অপর এক দূত ঘূর্ণিবায়ুর রূপ ধারণ করিয়া ময়নামতী-রক্ষিত রাজার শয়নকক্ষের চারিকোণের চারিটি দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিল এবং রাজার জন্য স্ফটিক পাত্রের জল নিঃশেষে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল। বুদ্ধি-যম সকলের অলক্ষ্যে, রাজাকে অপর কোন রাণীর হস্তের জল পান করিতে নিষেধ করিয়া দিল। সর্ব্বশেষে, ভাড়ুয়া বা নিশা-যম নামক যমদূত, সকলের অজ্ঞাতসারে রাজা মাণিকচন্দ্রের প্রতি 'মরণ-তৃষ্ণা' নামক প্রাণান্তক বাণ নিক্ষেপ করিল—

রাজা, মৃত্যুকালীন দারুণা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া 'জল'—'জল' শব্দে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

জলের জন্য কাতর ক্রন্দন শুনিয়া মাণিকচন্দ্রের এক কুড়ী রাণী সুবাসিত সুশীতল জল লইয়া উপস্থিত হইল—কিন্তু রাজা তাহা পান করিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন—'তোমাদের সকলের প্রদত্ত জলে আঁইসের গন্ধ—ও জল আমি স্পর্শ করিতে পারিব না।' এই বলিয়া ময়নামতীকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'তুমিই আমায় এই দারুণ তৃষ্ণার সময় একঝারি সুশীতল জল দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর—তোমার জল পান করিলে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে।'

রাজার এই কথা শুনিয়া ময়নামতী বলিলেন, 'রাজবাড়ীর কূপে জল নাই; সুতরাং, আমি যদি এখন আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে জল আনিতে যাই, তাহা হইলে গোদা-যম এখনই সুযোগ বুঝিয়া, আপনাকে বাঁধিয়া যমালয়ে লইয়া যাইবে।' রাজা বলিলেন—'ইহার জন্য তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না; তুমি আমার শয্যা-পার্শ্বে, তোমার 'তৈলপাটের খাঁড়া' রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে জল আনিতে যাও। গোদা-যম, দৈত্য-দানব বা যে কোনরূপ ছদ্ম-বেশ ধারণ করিয়া আসুক না কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে

ঐ খাঁড়া দিয়া কাটিয়া ফেলিব। তুমি যাও আর বিলম্ব করিও না—শীঘ্র জল আনিয়া আমার জীবন রক্ষা কর।

রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, ময়নামতী জল আনিবার জন্য ঝারি হস্তে রাজবাটীর বাহির হইলেন—এদিকে সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ হাঁচি-টিকটিকির নিষেধাজ্ঞাসূচক নানারূপ বাধা পড়িল। যে মুহূর্ত্তে ময়নামতী তোরণদ্বারের বহির্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রাজবাড়ীর সপ্তদ্বার দিয়া সপ্তজন যমদূত, ভীষণ গর্জ্জন সহকারে রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং রাজাকে চর্ম্ম-রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা ভীষণ তাড়না করিতে লাগিল। রাজা কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন—'আমায় কেন এমন নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছ—ময়নামতী জল আনিতে গিয়াছে—আমায় উদর পূর্ণ করিয়া জল পান করিতে দাও, তাহার পর তোমাদের যেরূপ অভিলাষ করিও—দারুণ তৃষ্ণায় আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে।'

যমদূতগণ রাজা মাণিকচন্দ্রের ক্রন্দন ও কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিল—'তোমার পত্নী সামান্যা মহিলা নহে—সে গুরু গোরক্ষনাথের বর লাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছে—সে এখানে উপস্থিত হইলে, আমাদের মহা অমঙ্গল ঘটাইবে—আমাদের দুর্দ্দশার সীমা রহিবে না—আমাদের

বুকের উপর হাঁটু গাড়িয়া এই দিবা দ্বিপ্রহরেই সর্ব্বজন সমক্ষে প্রচণ্ড প্রচণ্ড কীল মারিয়া আমাদের প্রাণান্ত করিয়া তুলিবে—আমরা তাঁহার জল লইয়া ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই তোমার প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিব।' এই বলিয়া যমদূতগণ রাজা মাণিকচন্দ্রকে পূর্ব্ববৎ লৌহমুদ্গরদ্বারা বিষম তাড়না করিতে লাগিল। রাজা ছয়মাসের রুগ্‌ণ শরীরে লৌহদণ্ডের প্রচণ্ড তাড়না ও চর্ম্মরজ্জুর প্রবল পীড়ন আর অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না—'ময়না—জল'—'ময়না—জল' বলিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

গোদাযম, মহারাজ মাণিকচন্দ্রের নয়বুড়ী রাণীর মধ্য হইতে, তাঁহার প্রাণ দণ্ডাগ্রে বান্ধিয়া লইয়া যমালয় অভিমুখে দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিল—সপ্তদূত সপ্তদ্বার দিয়া সপ্তদিকে অদৃশ্যভাবে চলিয়া গেল!—মহারাজ মাণিক-চন্দ্রের কঙ্কালসার প্রাণহীন নশ্বরদেহ, রাজশয্যায় নিঃস্পন্দ-ভাবে পড়িয়া রহিল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—'মরিলে বাহুড়ে যদি হারাইলে পাই।
তবে কেন সংসারেতে আপদ বালাই' ॥
—'বিধাতার কলম খণ্ডনে না যাএ।
ভাঙ্গাগড়া দুটি কর্ম্ম বিধাতা করাএ ॥"

ময়নামতীর যমালয়-যাত্রা—বরলাভ

ময়নামতী, মণিমুক্তা ও হীরাপান্না-খচিত লক্ষমুদ্রার সুবর্ণের ঝারি হস্তে, গঙ্গাতীরে রাজার নিমিত্ত পানীয় জল লইবার জন্য গমন করিয়াছেন। রাণী গঙ্গা-দেবীকে উদ্দেশ করিয়া করজোড়ে বলিলেন—'মা গঙ্গে,আমার স্বামী মহারাজ মাণিকচন্দ্র, দ্বাদশবৎসর ধরিয়া নিত্য আপনার পূজা করিয়াছেন,—এখন তাঁহার অন্তিম দশা উপস্থিত—জলাভাবে তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়াছে—আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার চিরভক্ত মহারাজের জন্য এক ঝারি জল, আমায় লইতে অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করুন'।

গঙ্গাদেবী বলিলেন—'রাণি, একঝারি কেন, বিয়াল্লিশ ঝারি জল লও, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু জল লইবে কাহার জন্য? ধার্ম্মিক মহারাজ, মাণিকচন্দ্র ত এখনই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন'!

ময়নামতী গঙ্গাদেবীর নিকটে এই নিদারুণ অশুভ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং সেই মণিমুক্তা-হীরাপান্না-খচিত লক্ষমুদ্রার স্বুবর্ণ ঝারি পাক দিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন! ময়নামতী তদ্দণ্ডে বাটী প্রত্যাগমন না করিয়া গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং 'চৌদ্দতাল' জলের নিম্নে 'আসন' করিয়া ধ্যানস্থা হইলেন। দেখিতে দেখিতে, তাঁহার ললাটের সমুজ্জ্বল সিন্দুর-রেখা মলিন হইয়া গেল—তাঁহার যুগলহস্তের লক্ষমুদ্রার অরুণ বর্ণের 'মুঠ'-শঙ্খ মসীবর্ণ হইয়া গেল! তখন ময়নামতী বুঝিলেন—সত্য সত্যই তিনি স্বামি-হারা হইয়াছেন। ময়নামতী কপালে করাঘাত করিলেন—লক্ষমুদ্রার 'মুঠ'-শঙ্খ চূর্ণ হইয়া গেল! রাণী, স্বামীর জন্য কত ক্রন্দন কত বিলাপ করিলেন! অবশেষে, জলগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অগ্র-পশ্চাৎ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন।

ময়নামতী কিন্তু নিশ্চেষ্ট রহিলেন না—তিনি তাঁহার স্বামীর পুনর্জীবন লাভের জন্য, যমালয় পর্য্যন্ত গিয়া শেষ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন এবং এতদুদ্দেশে তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত জ্ঞাতি ও সপত্নীবর্গের উপর, মহারাজের

শরীর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া পদব্রজেই যমালয়ে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে এক ভয়ঙ্কর বৃহৎ ও সুদুস্তর নদী—বিস্তার এত অধিক যে, উহাতে একটি নৌকা বৎসরে একবারের অধিক 'খেয়া' দিতে পারে না। যেমন প্রচণ্ড নদী—তেমনি প্রচণ্ড তরঙ্গ! এক একটি তরঙ্গ যেন পর্ব্বতের চূড়া! ময়নারাণী এই নদীর তীরে আসিয়া মহাভাবনায় পড়িলেন। তিনি স্বীয় গুরুদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে গুরুদেব, আপনি ভিন্ন আমার সহায়-সম্বল অপর কেহ নাই। আমার ভাঙ্গা নৌকা—ভাঙ্গা হা'ল—শতধা ছিন্ন কাছি—আমি কেমন করিয়া এই উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল দুস্তর নদী উত্তীর্ণ হইব!—আপনি আমার সহায় হউন—আমি যেন এই দুরন্ত ও দুস্তর নদী আপনার কৃপাবলে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারি'।

ময়নাসুন্দরী, এইরূপে গুরুর কৃপা ভিক্ষা করিয়া স্বকীয় পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ নদীতরঙ্গের উপর বিস্তৃত করিয়া দিলেন এবং তদুপরি যোগাসনে বসিয়া ধর্ম্মরাজকে স্মরণান্তে যেমন তুড়্—তুড়্ শব্দে হুঙ্কার ছাড়িলেন, অমনি দেখিতে দেখিতে ছয়মাসের নদী অনায়াসে ছয়দণ্ডের মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। তদনন্তর পদব্রজে যমালয়ে যাত্রা করিলেন।

যমরাজ, ছত্রিশ কোটী দূতে পরিবেষ্টিত হইয়া রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া আছেন। ময়নামতী, যমরাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া বিকট হুঙ্কার ছাড়িলেন—যমরাজ ত্রস্ত হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন—ছত্রিশ কোটী অনুচর যে যেদিকে সুবিধা পাইল, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে পেটের কামড়ে কাতর ও অস্থির হইয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, কাহারও মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং এবংবিধ নানারূপ অসুস্থতার ভাণ করিয়া ঔষধ সেবনজন্য, তাহারা ময়নামতীর কবল হইতে আশুনিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিল।

স্বয়ং যমরাজ যোড়হস্তে ময়নামতীকে, তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—'আমি নিজের প্রয়োজনবশতঃই এখানে আগমন করিয়াছি—এত দিন জগতের এত লোকের প্রাণ হরণ করিয়াও তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না—আবার আমার স্বামীর প্রাণহরণ করিয়া আনিয়াছ! আমার স্বামীর প্রাণ এক্ষণে আমার সমক্ষে আনিয়া উপস্থাপিত কর ; নচেৎ এক হুঙ্কারে তোমার রাজ্য এই দণ্ডেই পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিব।'

যমরাজের সহিত ময়নামতী যখন এইরূপ কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত আছেন,সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া গোদা-যম দৌড়িয়া আপনার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিভৃত-স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ময়নামতী ধ্যানস্থা হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে,গোদা-যমই তাঁহার স্বামীর প্রাণ হরণ করিয়া আনিয়াছে। তখন তিনি মালিনীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গোদা-যমের 'মহলে' উপস্থিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গোদা-যমকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। গোদা-যম, আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বেড়া-টাটী ভাঙ্গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল—মালিনীরূপিণী ময়নামতীও মার মার শব্দে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

'নিধুয়া'-প্রান্তরে একশত কৃষক হলকর্ষণ করিতেছিল। ময়নামতী তাহাদের সম্মুখে পলায়মান হরিণরূপী গোদাযমকে তাড়া করিতে লাগিলেন। তখন গোদা-যম দিক্‌হারা ও অনন্যোপায় হইয়া ময়নামতীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চিংড়ীমাছের রূপ ধারণ করিয়া এক নদীগর্ভে প্রবেশ করিল। ময়নামতী তৎক্ষণাৎ বিয়াল্লিশ মহীষের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই নদীর জলে লম্ফ দিয়া পড়িলেন এবং সমগ্র জল তোলপাড় করিয়া নদীর মধ্যস্থানে গোদা-যমকে ধরিয়া ফেলিলেন। বলা বাহুল্য, ময়নামতী গোদা-যমকে যথেষ্ট

রূপ প্রহার করিলেন ; কিন্তু গোদা-যমের শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ়—সে ময়নামতীর প্রহারে আদৌ কাতর না হইয়া সফরী-মৎস্যের রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল—ময়নামতীও সঙ্গে সঙ্গে পানিকৌড়ী পক্ষীর রূপ ধারণ করিলেন এবং পাখার আঘাত মারিয়া 'মাঝ দরিয়ায়' তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু গোদার শরীর বজ্রতুল্য কঠিন—সে ময়নাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া হঠাৎ গচিমাছের রূপ ধরিয়া নিমেষমধ্যে কোথায় কর্দ্দমের ভিতর প্রবিষ্ট হইল, ময়নামতী তাহা দেখিতে পাইলেন না।

ময়নামতী কিছুক্ষণ ধ্যানস্থা হইয়া সন্ধান জানিতে পারিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজহংসের রূপ ধরিয়া কর্দ্দমের মধ্য হইতে গোদাকে বাহির করিয়া আনিলেন। এবারও গোদা-যম, পূর্ব্ববৎ ময়নাকে ধাক্কা দিয়া পলায়ন করিল।

গোদা-যম এবার 'ধুগ্‌ড়ী'র রূপ ধরিয়া একবারে পাতাল-পুরীতে গিয়া উপস্থিত হইল—ভাবিল, এইবার নিশ্চয় ময়নাকে ফাঁকি দিতে পারিয়াছে। তাহার আনন্দই বা কত ! সে আহ্লাদে 'গোঁফে তা' দিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে লাগিল,—'এইবার ময়নামতী আমায় কেমন করিয়া চিনিবে চিনুক দেখি' ! কিন্তু সে ময়নামতীর তীব্র দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। ময়নাসুন্দরী আরসুলারূপে পাতাল-

পুরে গিয়া গোদা-যমকে ধরিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর অল্পে অল্পে তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া উপুড় করিয়া ফেলিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে মুষ্টির আঘাত ও সমগ্র দেহে পদাঘাত করিয়া তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু গোদা-যমের শরীর বজ্রের ন্যায় কঠিন, ঐরূপ প্রহারেও সে কাতর হইল না। পরন্তু, 'গোলা'-কবুতরের রূপ ধরিয়া একবারে স্বর্গে উঠিয়া গেল। ময়নাসুন্দরীও শিকারী বাজ-পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া গোদাকে অবিলম্বেই ধরিয়া আনিলেন। তখন গোদা মূষিকের রূপ ধরিয়া এক বৈষ্ণব তেলীর বাড়ীতে প্রবেশ করিলে—ময়নাও সঙ্গে সঙ্গে বিয়াল্লিশ বিড়ালের রূপ ধরিয়া মাচার উপরে লুক্কায়িত গোদাকে লম্ফ দিয়া ঘাড়ে ধরিয়া ফেলিলেন। গোদাও তদ্দণ্ডেই তাঁহার অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া পলায়ন করিল।

এইবার গোদা সর্ব্বাঙ্গে 'কাঁকড়া'-মাটীর তিলক রচনা করিয়া বৈষ্ণবের রূপ ধারণ করিল এবং অপরাজিতার মালা ও এরণ্ডবৃক্ষের যষ্টি লইয়া এক বৈষ্ণবের 'আখড়ায়' গিয়া সমবেত বৈষ্ণবগণের মধ্যে বসিয়া রহিল। ময়নামতী, ধ্যানে তাহার অবস্থানের সন্ধান পাইয়া, এক মৌমাছির পরিবর্ত্তে বিয়াল্লিশ মৌ-মাছির রূপ ধরিয়া আখড়ার যাবতীয় বৈষ্ণবের মস্তকোপরি উড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ এত মৌমাছির আবির্ভাবে সমবেত বৈষ্ণবগণ সন্দিহান হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—'নিশ্চয়ই এই মণ্ডলীর

মধ্যে কোন অপরাধী বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইয়াছে'। মৌমাছিগুলি উড়িতে উড়িতে যেমন বৈষ্ণবরূপী গোদা-যমের সমীপস্থ হইল, অমনি বিয়াল্লিশ মাছি একত্র হইয়া তাহার ঘাড়ে হুল ফুটাইয়া দিল। গোদা, যন্ত্রণায় 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

এইবার ময়নামতী স্ব-রূপ পরিগ্রহ করিয়া পলায়নপর গোদা-যমকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ত্রি-পথের সন্ধিস্থলে বসিয়া এক 'পাঙ্গা' খড়ের দড়ী পাকাইলেন। তদনন্তর গোদা-যমকে সেই দড়ী দিয়া বাঁধিয়া, দড়ীর অপর প্রান্ত আপনার কটিদেশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন এবং হেন্তালের লাঠি দিয়া তাড়না করিতে করিতে যমকে লইয়া চলিলেন।

গোদা-যম এখন আর তাঁহার কবল-মুক্ত হইতে পারিবে না জানিয়া, ময়নামতী গোদা-যমকে বলিলেন—'তুমি আমার স্বামীর জীবন লইয়া আসিয়াছ—এখন আমায় তাহা প্রত্যর্পণ কর'। গোদা-যম কিন্তু এত লাঞ্ছনা এত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও তাঁহার স্বামীর জীবন প্রত্যর্পণ করিতে কোন-মতেই স্বীকৃত হইল না। তখন ময়নামতী, স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ রোদন করিয়া আপন মনে মনে বলিতে লাগিলেন—'হে দীননাথ, ঘরে আমার স্বামী নাই—আমি কেমন করিয়া সেই নবনির্ম্মিত ঘরে গিয়া একাকিনী বাস করিব'।

কিয়ৎকাল পরে, ময়নামতী আত্মসংবরণপূর্ব্বক দারুণ হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন। দেখিতে দেখিতে যত মুনিঋষি

আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তাঁহার দীক্ষাগুরু স্বয়ং গোরক্ষ-নাথ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন—ঢেঁকী-বাহনে নারদ ঋষি, বৃষভ-বাহনে ভোলা মহেশ্বর, ধনু-বাহনে বা ধনুকে ভর করিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঞ্চপাণ্ডব শুভাগমন করিলেন। এতদ্ব্যতীত কত মুনিঋষির যে আবির্ভাব হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ময়নামতী তখন আপনার মস্তকের কেশরাশি দুইভাগে এলাইয়া দিয়া, দেবতা ও ঋষিগণের সমক্ষে গুরু গোরক্ষনাথ বিদ্যাধরের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। বলিলেন —'আপনি আমায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন—যম আমার স্বামীর প্রাণহরণ করিয়া আনিয়াছে—আমায় আর প্রত্যর্পণ করিতে কোনমতেই স্বীকৃত হইতেছে না'।

ময়নামতীর এরূপ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরু গোরক্ষনাথ এবং সমবেত দেবতা ও ঋষিগণ সমস্বরে বলিলেন —'দেখ' ময়নাসুন্দরি, জীবের মরণ হইলে পুনর্ব্বার সেই জীবন লাভ করা অসম্ভব—তোমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে—তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার কোন উপায় নাই। মরিলে যদি পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হয়, লুপ্ত দ্রব্য যদি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে এ সংসারে আর আপদ্ বালাই রহিল কি? বিধাতার লিখন খণ্ডিত হইবে না—জন্ম-মৃত্যু, ভাঙ্গা-গড়া বিধাতার কর্ম্ম,—তাহার উপর কাহারও হাত নাই'। তদনন্তর গোরক্ষনাথ এবং সমবেত দেবতা ও

ঋষিগণ পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও বর প্রদান করিয়া বলিলেন—'ময়নাসুন্দরি, তুমি পৃথিবীতে ফিরিয়া যাও, আমাদের বরে তোমার গর্ভে এখনই সাত-মাসের পুত্র আবির্ভূত হইবে। এই পুত্র আঠার মাস গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হইবে এবং উনিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তবে যদি বিশেষ অনুতাপ করিয়া হাড়ির চরণ ভজনা করে, তাহা হইলে অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে'। এই বলিয়া গুরু গোরক্ষনাথ, দেবতা ও ঋষিগণ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ময়নামতীর উপর গুরু, দেবতা ও ঋষিগণের এই আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবামাত্রই, তাঁহার শোলার ন্যায় ক্ষীণ ও লঘু শরীর, সাতমাস গর্ভবতী নারীর দেহের ন্যায় স্থূল ও গুরু হইয়া উঠিল।

কোন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া ময়নামতী যমালয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আবাসে আসিয়া উপনীত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

'অনলত পোড়া না যায় জলত না হয় তল ।
তিন ভুবন টলিয়া গেলে না যায় যমের ঘর ॥'
'কোলোতে পুড়িয়া রাজাক্ কোলোতে কৈল্ল ছাই ।
ব্রহ্মার ভিতর বসি থাক্‌ল মএনা লোহার কলাই ॥'

ময়নামতীর সহমরণোদ্যোগ—গোপীচন্দ্রের জন্ম

মহারাজ মাণিকচন্দ্রের মৃতদেহ এখনও অন্তঃপুরে পড়িয়া রহিয়াছে। আষাঢ় মাস—সমগ্র পৃথিবী জলময়। শবদাহনের জন্য কোথাও তিলমাত্র স্থান নাই!

ময়নামতী, এত ব্যাপার করিয়াও যথাসময়েই যমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজার মৃতদেহ সৎকারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 'নয়কড়া কড়ি' সহ গঙ্গাতীরে আসিয়া গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে স্তবস্তুতি করিয়া ময়না তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। গঙ্গাদেবী তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া, নয় কড়ার পরিবর্ত্তে নদীর তীরে এক বালুচর-ভূমি, রাজার দেহসৎকার জন্য প্রদান করিলেন।

ময়নামতী, প্রাচীন ও জীর্ণ বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া নদীতীরে পর্ব্বতপ্রমাণ শুষ্ক কাষ্ঠ আনয়ন করাইলেন। নগরের প্রত্যেক অধিবাসী এক এক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ প্রদান করিল। কলসী কলসী তৈল ও ঘৃত এবং যথেষ্ট পরিমাণে সর্ষপ-তৈল প্রভৃতি সংগৃহীত হইল। স্তূপাকার চন্দন এবং

ধূপাদি গন্ধদ্রব্য ভারে ভারে আনীত হইল। তাহার পর কাঁচা বাঁশের 'মাচা' নির্ম্মাণ করিয়া মহারাজ মাণিকচন্দ্রের মৃতদেহ, সেই নদীর তীরে আনয়ন করিলেন। যাবতীয় জ্ঞাতিকুটুম্ববর্গও সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তদনন্তর উত্তর-দক্ষিণে চিতা সজ্জিত এবং ঘৃত ও তৈলের কলসীগুলি সারি সারি চিতার সন্নিকটে স্থাপিত হইল। এই সময় ময়নাসুন্দরী, স্বামীর সহিত 'সহমৃতা' হইবার আকাঙ্ক্ষায় গুরু গোরক্ষনাথকে মনে মনে স্মরণ করিলে, তিনি অপর সকলের নিকটে অদৃশ্য রহিয়া তাঁহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন—'ময়না, তুমি স্বামীর সহিত চিতায় আরোহণ কর, তোমার কুশের বিঘ্ন হইবে না—চিতানলের মধ্যে রহিয়াও তোমার শরীরে মাঘ মাসের ন্যায় শীত বোধ হইবে।'

এইবার ময়নামতী, সমগ্র ললাট-দেশে সমুজ্জ্বল সিন্দুর লেপন করিয়া উভয় হস্তে রাম-লক্ষ্মণ শঙ্খ ও অঙ্গে রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন এবং আম্রপল্লব হস্তে লইয়া চিতায় আরোহণ করিলেন। রাজাকে উত্তর-দক্ষিণে স্থাপন করিয়া ময়না তাঁহার বামপার্শ্বে শয়ন করিলেন—রাজার মস্তক রাণীর দক্ষিণ হস্তের উপরে স্থাপিত হইল।

চাঁদ সওদাগর ও সমবেত অপরাপর জ্ঞাতিগোষ্ঠিগণ, চিতা পরিক্রম করিয়া চন্দন, চূয়া ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্যাদি চিতার উপর ছিটাইয়া দিল। এইবার অগ্নিসংযোগ করিতে হইবে—কিন্তু অগ্নি কোথায়? নিকটে কোথাও একরতি

পরিমাণও অগ্নি নাই। তখন সকলের পরামর্শানুসারে গুরুপারণের গৃহ হইতে অগ্নি সংগৃহীত হইল। জ্ঞাতিবর্গ ‘হরিবোল হরিবোল’—শব্দে চিতার চতুর্দ্দিকে এক পাক—দুই পাক করিয়া পাঁচ পাক ঘুরিয়া অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিল। চিতা ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কলসী কলসী ঘৃত ও তৈল প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র অগ্নিশিখা প্রচণ্ডতেজে জ্বলিয়া উঠিয়া গগনস্পর্শ করিল—ধূপাদির ধূমে চতুর্দ্দিক্ সুগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। জ্ঞাতিগণ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া সতী ময়নার জয়ধ্বনি ও উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিল।

আকাশপ্রমাণ স্তূপাকার কাষ্ঠ, শত শত কলসীপূর্ণ ঘৃত ও তৈল সংযোগে সাতদিন নয় রাত্রি অবিরাম জ্বলিতে লাগিল। পরে চিতার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, জ্ঞাতিগণ আসিয়া দেখিল,—ময়নামতী অক্ষুণ্ণদেহে স্বামীর ভস্মাবশেষ ক্রোড়ে করিয়া অবিকৃতদেহে বসিয়া আছেন—তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে অগ্নির উত্তাপ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই! পরন্তু, তাহা হইতে যেন শীতল জল শতধারায় চুয়াইয়া পড়িতেছে! ধর্ম্মী রাজা মাণিকচন্দ্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলেন—সেই অগ্নির ধূম গগন স্পর্শ করিল—কিন্তু ময়নামতী, দগ্ধ হওয়া ত দূরের কথা, সেই প্রচণ্ড অগ্নিস্তূপের মধ্যে, সাত দিন নয় রাত্রি একাসনে বসিয়া কাঁচা সোণার ন্যায় আরও উজ্জ্বল, আরও মহিমান্বিতা হইয়া উঠিলেন!

ময়নামতীর জ্ঞাতিবৃন্দ কিন্তু ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল না, বা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিল না। তাহারা, স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার অসামর্থ্য বোধে, ময়নামতীর প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিল এবং দেশের ভাবী সমূহ অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া, যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহার প্রাণনাশ করিবার সঙ্কল্প ও ষড়যন্ত্র করিল।

একজন জ্ঞাতি অপর একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—'ময়নাকে শত ধিক্কার দিতে হয়—ময়না, কোন্ মুখে অনলের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া আছে?' ময়নামতী তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—'আপনারা আমায় ধিক্কার দিবেন না—আমার গর্ভে সাত মাসের সন্তান রহিয়াছে'। তখন তাহারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য চাঁদ সওদাগরের নিকটে আগমন করিল।

চাঁদ সওদাগর, সদর দরজায় বসিয়া পাশা-ক্রীড়া করিতেছেন। এই নিমিত্ত, খিড়্কী দরজা দিয়া জ্ঞাতিবর্গ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া নমস্কার বিজ্ঞাপিত করিল। চাঁদ সওদাগর জ্ঞাতিবর্গকে তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল—'ময়নাসুন্দরী চিতানলের মধ্যে সাত দিন নয় রাত্রি একাসনে বসিয়া রহিল, তথাপি তাঁহার দেহে অগ্নি স্পর্শ করিল না। ময়না গোরক্ষনাথের বর প্রাপ্ত হইয়াছে। সে অনলে পুড়িবে না, জলে ডুবিবে না; এমন কি, তিন ভুবন টলিয়া গেলেও তাহার প্রাণনাশ হইবে না। কিন্তু আমরা চিতাপ্রত্যাগতা রমণীকে লইয়া

কেমন করিয়া দেশে ও সমাজে বাস করিব ? ইহার কোন আশু প্রতিকার করিতেই হইবে'।

জ্ঞাতিগণের এই কথা শুনিয়া চাঁদ সওদাগর বলিলেন—"তোমরা এক কর্ম্ম কর—ত্রি-পথের সন্ধিস্থলে বসিয়া বায়ান্ন কোটী খড়ের দড়ি বা 'বড়' প্রস্তুত কর এবং সকলে মিলিয়া বংশদণ্ডদ্বারা এক বাইশমণী পাথর লইয়া চল। তাহার পর, ময়নাকে চিতা হইতে সজোরে নামাইয়া আন এবং তাহার স্বামীর অঙ্গার-সহ তাহার বুকে ঐ দড়ি দিয়া, সেই বাইশমণী পাথর বাঁধিয়া গঙ্গার অতল জলে ডুবাইয়া দাও—সমস্ত আপদ্-বালাই চুকিয়া যাক্। তাহার পর স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া নিশ্চিন্তমনে আপন আপন বাটী প্রত্যাগমন করিবে।"

চাঁদের এই অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞাতিবর্গ, মহোৎসাহে শ্মশানে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ময়নামতীকে চিতাশয্যা হইতে সজোরে নিষ্ক্রান্ত করিয়া আনিল এবং তাঁহার বুকে বাইশমণী পাষাণ বাঁধিয়া, তাঁহার স্বামীর ভস্মাবশেষ ও অঙ্গারাদি সহ তাঁহাকে নদীর অতল গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া স্নানান্তে নিশ্চিন্তমনে যে যাহার বাটী প্রত্যাগমন করিল।

দেখিতে দেখিতে ময়নামতীর গর্ভকাল আঠার মাস আঠার দিন পূর্ণ হইয়া গেল। তখন তাঁহার গর্ভস্থ ধর্ম্মী রাজা গর্ভমধ্যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন—ময়নামতী তজ্জনিত বেদনায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ময়নামতী কিন্তু বুঝিলেন, তাঁহার প্রসবকাল আগত-প্রায়—এই নিমিত্ত তিনি 'স্বরূপ জ্ঞান' বা মহাজ্ঞান নিক্ষেপ করিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বায়ান্ন-কোটী খড়ের দড়ী ছিন্ন হইয়া গেল—বাইশমণী প্রস্তর বক্ষঃস্থল হইতে নদীগর্ভে এলাইয়া পড়িল।

এ দিকে ময়নার প্রসবযন্ত্রণা উপস্থিত—তিনি বন্ধন-মুক্ত হইয়া তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া তীরস্থিত এক নিম্বতরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঈশানকোণে, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হইয়া রাণীর গর্ভস্থ শিশু, 'ফুলে-জলে' ভূমিষ্ঠ হইল এবং ওয়াঁ চোঁয়া করিয়া তিনবার শব্দ করিল।

নগরবাসিগণ নদীতীরে নবজাত বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। ময়নামতী, তাহাদিগকে রাজবাটী হইতে রাজপাল্কী আনিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ঢাক ঢোল তম্বুরা বাজাইয়া পাল্কী চড়িয়া ময়নামতী, নবজাত ধর্ম্মী রাজাকে রাজবাটীতে লইয়া আসিলেন।

পথিমধ্যে কত করতাল কত বংশীধ্বনি হইল—বন্দুকের ধূমে আকাশ এমন ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া গেল যে, অন্ধকারে কেহ কাহাকে দেখিতে পাইল না—এমন কি, পিতার নিকটস্থ পুত্রকে শব্দদ্বারা ব্যতীত চিনিবার উপায় রহিল না! দেশময় আনন্দের মহারোল পড়িয়া গেল—সকলেই ময়নামতীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বিধা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'মাণিকচন্দ্র রাজার বেটা গোপীচন্দ্র থুইল।'

'অদুনাক দিয়া বিবাহ দিল পদুনাক দিল দানে।'

গোপীচন্দ্র-শৈশব-শিক্ষা-বিবাহ-রাজ্যাভিষেক

ময়নাসুন্দরী যে সময়ে নদীতীরে পুত্র প্রসব করেন, ঠিক্ সেই সময়ে, অপর এক দরিদ্র মহিলারও একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু, এই কাঙ্গাল প্রসূতির জীর্ণ কুটীরে কোনরূপ সংস্থান না থাকায়, প্রসব হইবামাত্র সে সেই পুত্রকে এক ত্রিপথের সন্ধিস্থলে পরিত্যাগ করিয়া আইসে। ময়নাসুন্দরী পাল্কী চড়িয়া বাড়ী আসিবার সময় এই সদ্যঃ-পরিত্যক্ত শিশুকে দেখিতে পাইয়া আদর ও যত্নসহকারে উহাকে কুড়াইয়া লইলেন।

রাজ-ধাত্রী সোনাই ধাই, এই উভয় শিশুরই নাড়ী-চ্ছেদন করিয়া বহু দান-সামগ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত হইল। রাণী ময়নাসুন্দরী আপন গর্ভজাত পুত্র ও প্রাপ্ত শিশু, উভয়কেই তুল্যরূপ স্নেহ ও যত্নসহকারে লালনপালন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে আজি কালি করিয়া ষষ্ঠ দিবস অতি-বাহিত হইল। তখন শিশুদ্বয়ের কল্যাণার্থ সপ্তম দিনে "সাদিনা", এবং এইরূপে দশম দিনে 'দশা' উৎসব অনুষ্ঠিত হইল।

ত্রিংশ দিবসে 'ত্রিশা' উৎসব উপলক্ষে যথারীতি সংকীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা হইল এবং যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠানের পর জ্ঞাতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করান হইল।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে, ময়নামতীর স্নেহময় ক্রোড়ে শিশুদ্বয়ের এক বৎসর, দুই বৎসর—শেষে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এইবার তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার জন্য, ময়নামতী উপযুক্ত গুরু মহাশয় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গুরু মহাশয় রাজপুত্রকে 'চারি কলমে' হস্তলিপি লিখিতে শিখাইয়া দিলেন।

ক্রমে শিশুদ্বয় সপ্তম বর্ষে উপনীত হইল। রাণী আপন পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র এবং পালিত পুত্রের নাম খেতুয়া (লঙ্কেশ্বর বা নেঙ্গা) রাখিলেন।

দেখিতে দেখিতে গোপীচন্দ্র নবম বর্ষে পদার্পণ করিল। রাণী ময়নাসুন্দরী তখন তাহার বিবাহ দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন।

সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের অদুনা ও পদুনা নামে দুই অলোকসামান্যা রূপসী কন্যার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের কথা, ময়নামতী পূর্ব্ব হইতেই শ্রুত হইয়াছিলেন। এখন যাহাতে এই সুবর্ণ পুত্তলি কন্যাযুগল পুত্রবধূরূপে আগমন করিয়া তাঁহার গৃহ আলোকিত করে, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিতা হইলেন এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থিরতর করিবার

জন্য হরিশ্চন্দ্র রাজার নিকটে ঘটক বা দূত-স্বরূপ গুরু ও ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন।

গুরু ও ব্রাহ্মণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণামান্তে তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য দিব্য সিংহাসন প্রদান করিলেন। নানাবিধ কুশলপ্রশ্নাদির পর, রাজা হরিশ্চন্দ্র, তাঁহাদের অগ্রে কর্পূর তাম্বূলাদি নিবেদন করিয়া, তাঁহাদের শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, 'আপনার অদুনা ও পদুনা দুই অপূর্ব্ব-রূপলাবণ্যবতী কন্যা আছে—আমাদের রাণী ময়নামতীর একান্ত আগ্রহ, আপনি আমাদের রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের সহিত আপনার কন্যার শুভ বিবাহ প্রদান করেন। এই নিমিত্ত, তিনি এই সম্বন্ধ স্থিরতর ও যোটক মিলন করাইবার জন্য আমাদিগকে আপনার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। এখন আপনি এই শুভ-সম্মিলনের অভিমত প্রদান করুন—ইহাই আমাদের একান্ত অভিলাষ।'

রাজা হরিশ্চন্দ্র এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না—তাঁহার জীবনের অবলম্বন প্রাণ-সর্ব্বস্ব অপ্সরাবিনিন্দিত কন্যাযুগল এমন সুপাত্রে অর্পিত হইবে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাঁহার প্রাণের ঈপ্সিতলাভের আকাঙ্ক্ষা, এত সহজেই পরিপূর্ণ হইবার সুযোগ বুঝিয়া তিনি যেন করতলে আকাশের চন্দ্র প্রাপ্ত

হইলেন। যোটকমিলন হইলে, তিনি সমাগত ব্রাহ্মণগণকে এই বৈবাহিক সম্বন্ধে আপনার সাগ্রহ ও সম্পূর্ণ অভিমত বিজ্ঞাপিত করিয়া যথোচিত সম্মানসহকারে 'বিদায়' দান করিলেন।

ময়নামতী, গুরু-ব্রাহ্মণের নিকটে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদানে সম্মতি জানিয়া সাতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং অচিরেই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারে ভারে গুয়া-পান কাটিয়া অনুষ্ঠেয় বিবাহের শুভাশুভ নির্ণয় করিলেন এবং তদ্দণ্ডেই আগামী শনিবার দিবস অধিবাসের এবং রবিবার দিবস বিবাহের লগ্ন স্থিরীকৃত হইল। কন্যালয় হইতে বিবাহের সঙ্কল্পসূচক 'পান-ফুল' প্রেরিত হইলে, ময়নামতী তাহা সাদরে গ্রহণ করিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র, কন্যার বিবাহের জন্য যথোচিত অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করিলেন। রাজবাটীর দ্বারে মাঙ্গলিক 'পঞ্চগাছি' কদলী বৃক্ষ প্রোথিত হইল এবং সভাস্থল সোনালী 'চালুন-বাতী' দ্বারা আলোকিত করা হইল। যথাসময়ে বর, বাদ্যভাণ্ড ও পঞ্চ বরযাত্রী সহ শুভাগমন করিয়া উলু ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র, কন্যা অদুনাকে গোপীচন্দ্রের করে সমর্পণ করিলেন এবং এই শুভ পরিণয়োপলক্ষে যৌতুক-স্বরূপ, তুল্যরূপ রূপলাবণ্যবতী কন্যা পদুনা সুন্দরীকে দান

করিলেন। এতদ্ব্যতীত, জামাতার ব্যবহার নিমিত্ত একশত বন্দিনী বা দাসী প্রদত্ত হইল। লক্ষ লক্ষ হীরা-মণি-মাণিক্যাদি বহুমূল্যবান্ কতপ্রকার দ্রব্যাদি যে প্রদত্ত হইল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই—একশত তালুক, একশত হস্তী, একশত বেগবান্ অশ্ব, একশত দুগ্ধবতী গাভী ইত্যাদি বিবাহে 'দান'-স্বরূপ, অতুল বৈভবশালী রাজা হরিশ্চন্দ্র, জামাতাকে প্রদান করিলেন।

গোপীচন্দ্র বিবাহান্তে অতুনা-পতুনা দুই স্ত্রী এবং অসংখ্য দান-সামগ্রী, অনুচর ও দাসীবৃন্দ সমভিব্যাহারে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন—রাণী ময়নামতী উলুধ্বনি দিয়া বর-বধূকে বরণপূর্ব্বক শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন। রাণী, পুত্রের অনুরূপ এবং নিজের মনোমত, সঞ্চারিণী সেফালি-স্তবকের ন্যায় দুই পরম রূপসী কন্যা বধূরূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

বিবাহের অনতিকাল মধ্যেই ময়নামতা দেশের যাবতীয় রাজন্যবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহাদের সকলের সমক্ষে যথাবিহিত অভিষেকপূর্ব্বক গোপীচন্দ্রকে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন।

রাজা গোপীচন্দ্র ইহার পর, রত্নমালা ও পদ্মমালা নাম্নী দুই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একটি খণ্ডকের এবং অপরটি উরুয়ার রাজকণ্যা। গোপীচন্দ্র উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এই কন্যারত্নদ্বয়

লাভ করিয়াছিলেন। উরুয়া-রাজকন্যা লাভ করিবার পূর্ব্বে গোপীচন্দ্রকে দশদিন যুদ্ধ করিয়া উরুয়া-রাজকে পরাস্ত করিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে গোপীচন্দ্র একদিনে চৌদ্দবুড়ী মনুষ্য নিহত করেন। সর্ব্বসমেত এই যুদ্ধে চৌদ্দ পণ মনুষ্য, সাতশত লস্কর, ষষ্টি সহস্র হস্তী ও অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছিল।

রাণীগণ এবং অগণিত দাসদাসী ও বিলাস-রমণী পরিবৃত হইয়া এবং বিবিধ ভোগ-বিলাসের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া রাজা গোপীচন্দ্র, অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া উনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—'মায়ে পোয়ে যোগী হয়ে জঞ্জাল এড়াই'।

—'যোগসিদ্ধা যোগী হয়ে হইবে অমর'।

সন্ন্যাসের প্রস্তাব

রাজা গোপীচন্দ্র, অন্তঃপুরমধ্যে অদুনা-পদুনাপ্রমুখ ছয় কুড়ী রাণী-পরিবৃত হইয়া বিলাস-কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। কোন রাণী শ্বেত চামর লইয়া রাজাকে ব্যজন করিতেছেন—আবার কোন রাণী কর্পূরসংযুক্ত সুবাসিত তাম্বূল রাজার বদনে অর্পণ করিতেছেন।

প্রধানা মহিষীদ্বয় অদুনা ও পদুনা রাজার সমীপে উপবিষ্টা আছেন। কি তাঁহাদের রূপ, কি তাঁহাদের অঙ্গ-কান্তি, কি তাঁহাদের সুগঠিত দেহ—যেন মূর্ত্তিময়ী সৌদামিনী অচঞ্চল রূপ ধরিয়া রাজার নিকটে বসিয়া আছেন! অঙ্গের কি লাবণ্য-বিভা—যেন প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় গর্ গর্ করিতেছে। ছয় কুড়ী রাণী—সকলেই অপূর্ব্বরূপ-লাবণ্যবতী—সকলেই অপূর্ব্ব সুশ্রী, অপূর্ব্ব সুন্দরী। কিন্তু, অদুনা পদুনার নিকটে ইঁহারা সকলেই যেন মলিন, সকলেই যেন নিষ্প্রভ। অদুনা পদুনা তাঁহাদের নিকটে বসিয়া আছেন,—মনে হইতেছে যেন অন্ধকারাবৃত স্থানে ভাস্বর মাণিকযুগল, আপনার অঙ্গরাগ ও কিরণচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। অদুনা পদুনার রূপের কি

তুলনা হয়? তাঁহাদের রূপ দেখিলে প্রফুল্ল কমলও যেন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া যাইবে।

গোপীচন্দ্র যখন বিলাস-কক্ষে মহিষীগণের সহিত বিশ্রম্ভালাপ ও নানারূপ রহস্য-কথায় নিযুক্ত রহিয়াছেন,—যখন সকলেই অসংবৃত অবস্থায় কৌতুক-তরঙ্গে ভাসিয়া লহরে লহরে দুলিতে দুলিতে কোন অনির্দ্দিষ্ট সুখময় স্বপ্ন-নিকেতন-অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—ঠিক্ সেই সময়ে ময়নামতী হঠাৎ অতর্কিতভাবে তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এক বিষাদের ছায়াপাত করিয়া দিলেন। রাজা গোপীচন্দ্র জননীকে দেখিবামাত্র সম্ভ্রমসহকারে আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তৎপরে অবনত মস্তকে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন। বধূরাণীগণ সঙ্কোচ সহকারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

ময়নামতা গোপীচন্দ্রকে বলিলেন—'দেখ গোবিন্দাই, তোমার নিকটে আমার একটি বিশেষ বক্তব্য আছে'। গোপীচন্দ্র, অসময়ে অতর্কিতভাবে, তাঁহার বিলাস-কক্ষে জননীর আগমনে কোন এক গুরুতর দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিয়াছিলেন—এই নিমিত্ত, তিনি জননীর এবংবিধ বাক্য শুনিয়া অবিলম্বে তাঁহার বক্তব্য বর্ণন করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিলেন।

ময়নামতী বলিলেন—'আমার বক্তব্য অপর কিছু নহে। চল, আমরা মাতাপুত্রে যোগী বা সন্ন্যাসী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে

সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক এই সংসারের যাবতীয় জঞ্জাল হইতে পরিত্রাণ লাভ করি। জীবন অনিত্য—যম নিষ্ঠুর, তাহার শরীরে দয়ার লেশমাত্র নাই। কখন হঠাৎ আসিয়া প্রাণপক্ষী কাড়িয়া লইবে—আমাদের দেহ-পিঞ্জর তখন শূন্য পড়িয়া থাকিবে—কেহ ফিরিয়াও চাহিবে না। যমের অসাধ্য কি আছে? এই যে অসংখ্য-দাসদাসী-মুখরিত প্রকাণ্ড অট্টালিকামধ্যে এত সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বিরাজ করিতেছে, যম এমনই শক্তিমান্ যে, সে ইহাদের মধ্য হইতেও 'ডাক' দিয়া তোমার প্রাণ হরণ করিয়া লইবে—তাহাদের কাহারও সাধ্য নাই যে, কোন মতে তাহাকে সামান্যমাত্রও বাধা দিতে পারে। যম কোন্ পথে আসে—কোন্ পথে যায়—কেহ তাহা দেখিতে পায় না। সে সকলের নিকটে নিকটে বেড়াইলেও কেহ তাহাকে চিনিতে পারে না।

'তোমার এই যে পর্ব্বতপ্রমাণ অসংখ্য হস্তিযূথ, অগণিত বায়ুবেগসমন্বিত তুরঙ্গম, পঙ্গপালসদৃশ পদাতিক সৈন্য—এ সকল কি?—এ সকল অনলে দগ্ধীভূত ভস্ম ও অঙ্গার-সদৃশ! এতদ্ব্যতীত ইহাদের আর কি মূল্য আছে? এই যে নবযৌবনোদ্গমে তোমার পুষ্ট কলেবর হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে—ইহার স্থায়িত্ব কতক্ষণ? জোয়ারের জল যেমন স্ফীত হইয়া অচিরেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তেমনি তোমার দেহের এই পরিপুষ্টি ও কুলপ্লাবী বহির্বিকাশও দেখিতে দেখিতে অচিরেই কোথায় কেমন

করিয়া সঙ্কুচিত, বিশুষ্ক ও মলিন হইয়া যাইবে! এই নশ্বর মৃণ্ময় দেহ অচিরেই মৃত্তিকায় মিশিয়া যাইবে—ইহার জন্য যত্ন-পরিচর্য্যা, সেবা-শুশ্রূষা সবই বৃথা!

'বৎস গোপীচন্দ্র, তোমার বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। ঊনবিংশ বর্ষে তোমার মৃত্যু-যোগ। শূন্য-পথে নিষ্ঠুর যম কখন কোন্ দিকে আসিয়া গলায় পা দিয়া জীবন বাহির করিয়া লইয়া যাইবে, তাহা কেহ দেখিতে বা জানিতে পারিবে না। তখন জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কে কি করিবে? তাহারা হয়ত কিছুক্ষণ ধরিয়া কেহ বা শোক প্রকাশ করিবে, কেহ বা ক্রন্দন করিবে—পরে, যে যাহার আলয়ে প্রস্থান করিবে। কিন্তু অভাগিনী জননীর দশা কি হইবে?—তাহাকে যাবজ্জীবন ক্রন্দন করিতে হইবে—হায় হায় শব্দে বক্ষে করাঘাত করিয়া বিলাপধ্বনি করিতে হইবে। বাবা, এ নবযৌবন কচুপাতার জলের ন্যায় নিয়ত টলমল্ করিতেছে; এ রূপও দীর্ঘকাল থাকিবে না, পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। আমার উপদেশ শ্রবণ কর—মান্য কর—আমি যাহা বলি তদনুসারে কার্য্য কর। তাহা হইলে যম তোমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না, তুমি চিরকাল যোগসিদ্ধ যোগী হইয়া বর্ত্তমান থাকিবে।'

গোপীচন্দ্র, ঝটিকাপ্রবাহের ন্যায় জননীর এইরূপ বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় নির্ব্বাক্ ও নিঃস্পন্দ হইয়া গেলেন। এ কিরূপ পরিহাস! কোথায়

পৌর্ণমাসী রজনীর সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় মলয়হিল্লোলবাহিত ফুল্লকুসুমসেবিত সুরভিশ্বাস—আর কোথায় প্রবলঝটিকা-সঙ্ক্ষুব্ধ ঘনঘোর অমানিশার প্রবলঝঞ্ঝাবায়ুধ্বনিত অকাল মৃত্যুর নির্ম্মম আহ্বান! এ কি সত্য না প্রহেলিকা! একি মায়া না মতিভ্রম!—গোপীচন্দ্র ইত্যাকার চিন্তা করিয়া কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না।

আপনার গর্ভধারিণী জননীর নিকট হইতে আসন্ন মৃত্যুর এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, গোপীচন্দ্র যে ইতঃপূর্ব্বে রমণীগণপরিবৃত হইয়া বিলাস-কক্ষে রসরঙ্গে প্রমত্ত ছিলেন, সে কথা তাঁহার মন হইতে কোথায় অপসৃত হইয়া গেল! কিয়ৎক্ষণের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তিনি যেন সমগ্র জগৎ ঘোর অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। মুখে বাক্য নাই—শরীরে স্পন্দন নাই—চক্ষে পলক নাই! একবারে—নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ ও নির্ণিমেষ!

নবম পরিচ্ছেদ

'হাড়িফা মানুষ নহে জ্ঞান তার ঠাঞী'।

—'হাড়ি নহে হাড়িফা বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী'।

হাড়িফা—পূর্ব্বকথা, পরিচয়

গোপীচন্দ্র, বহুক্ষণ জননীর প্রতি বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন—'মা, আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। অপরের জননী, আপন পুত্রকে চিরকাল গৃহে বাস করিয়া যাবতীয় বৈভবসুখভোগ করিবার আশীর্ব্বাদ করেন, আর আপনি আমায় এই অতুল সুখসম্পদের মধ্য হইতে যৌবনের প্রারম্ভেই গৃহত্যাগ করিয়া যোগী সন্ন্যাসী হইবার জন্য আদেশ করিতেছেন—অপরের জননী, পুত্রপৌত্রাদি লইয়া 'দুধে-ভাতে' সুখে থাকিবার জন্য বর প্রার্থনা করেন, আর আপনি নির্ম্মমভাবে আমার প্রথম যৌবনে, সর্ব্ববিধ সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহত্যাগের আদেশ প্রদান করিতেছেন—আপনার কোমল হৃদয় হঠাৎ এমন পাষাণ-সদৃশ হইল কেন ?

ময়নামতী বলিলেন—'আমি এত কাল সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম—আজ উপযুক্ত সময়েই সে সকল কথা স্মরণ হইল। গুরু রক্ষা করিলেন—নচেৎ মহা অনর্থ সংঘটিত হইত। তুমি অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ঊনবিংশ বর্ষে

পদার্পণ করিতে চলিলে—এই সময় আমার পূর্ব্বকথা আজ স্মৃতিপথে উদিত না হইলে, তোমা হেন পুত্ররত্নকে, আমি যমের নির্ম্মম কবল হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা পর্য্যন্তও করিতে পারিতাম না'। তদনন্তর তিনি গোপীচন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং ঊনবিংশ বর্ষের প্রারম্ভে সন্ন্যাসান্তে হাড়িফার চরণ ভজনা না করিলে মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি কথা, আমূল প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

গোপীচন্দ্র জননীর নিকটে এই অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন—'মা, এ সকল কথা ত আমায় একদিনও বলেন নাই—আজ হঠাৎ মনে পড়িল কেন' ?

ময়নামতী বলিলেন—'গুরু রক্ষা করিয়াছেন ; এতদিন এ-সব কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আজ উপযুক্ত সময়েই মনে পড়িয়াছে। আজ প্রাতে আমি 'বালাখানায়' বসিয়া আছি—দেখিতে পাইলাম, পশুশালায় নিযুক্ত এক হাড়ি, ঝুড়ি-কোদালি হস্তে লইয়া এক শিশু সহ রাজপুরী অভিমুখে আগমন করিতেছে। হাড়ি, ক্রমে ক্রমে মৃণ্ময় গড়, বংশীবট-গড়, স্ফটিক-গড়, হীরা-গড়, লৌহ-গড় ও ধবল-গড় অতিক্রম করিয়া ফল-গড়ে আসিয়া উপনীত হইল। ফল-গড়ে—আম্র, কাঁটাল, গুবাক, নারিকেল, হরিতকী, জায়ফল, এলাইচ, লবঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার ফলবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। প্রভাতে নানাজাতি গায়কপক্ষী ফলভারাবনত বৃক্ষের শাখায় প্রশাখায় উড়িয়া উড়িয়া কল-কূজনে ফলগড়

মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। হাড়ি সেই স্থানে নিস্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান রহিয়া এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ত্যাগ করিল —আর তৎক্ষণাৎ ফলফুলসমন্বিত যাবতীয় বৃক্ষ, নতশীর্ষ হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল! হাড়ি তখন কতকগুলি ফল সংগ্রহ করিয়া পার্শ্বস্থ শিশুর হস্তে প্রদান করিল। তদনন্তর পুনরায় পূর্ব্ববৎ হুঙ্কার ত্যাগ করিল—আর নিমেষমধ্যে নতশীর্ষ বৃক্ষরাজি যথাপূর্ব্ব ঊর্দ্ধশীর্ষ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। আমি স্বচক্ষে এই সকল দেখিয়া বুঝিলাম, পশুশালায় হাড়ি-কর্ম্মে নিযুক্ত এ ব্যক্তি হাড়ি নয়—হাড়িফা। এখানে তিনি গুপ্তবেশে বাউলরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। আজ তিনি অভিশাপমুক্ত হইলেন—তুমি ইঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ কর'।

জননীর এই কথা শ্রবণ করিয়া গোপীচন্দ্র ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'মা, আপনি কি বলিতেছেন, আপনার এরূপ মতিভ্রম হইল কেন? আমার পশুশালার একজন হাড়ি, জঘন্য হাড়ি-কর্ম্ম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, ভ্রমেও কখন স্নান করে না, শুদ্ধাচার কাহাকে বলে জানে না—আমি গোপীচন্দ্র, 'বাইশ দণ্ডের' রাজা হইয়া কেমন করিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব?'

ময়নামতী বলিলেন—"না, বাবা, ও হাড়ি, হাড়ি নহে—পরম পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি মহাদেবীর অভিশাপগ্রস্ত হইয়া তোমার পশুশালার হাড়ি-

কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার আদি-বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর—"একদিন মা ভবানী শঙ্করকে বলিলেন, 'আপনি ত নিজে মহাযোগী হইয়াও গঙ্গা-গৌরী দুই পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন, তবে আপনার অনুগত যোগিবৃন্দও কেন পত্নী গ্রহণ করিয়া গৃহবাস করুক না।' মহাদেব বলিলেন—'দেখ, ভবানি, মানুষ স্বভাবতঃই কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের একান্ত বশীভূত হইয়া পড়ে—এ সকলের মধ্যে অবস্থিত রহিয়া অনাসক্তভাবে জীবন যাপন করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং, সিদ্ধাগণের পক্ষে পত্নী গ্রহণ বিধিসঙ্গত নহে।' শঙ্করের এই কথা শুনিয়া ভবানী বলিলেন—'আচ্ছা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা ও কালুফা—আপনার এই চারি সিদ্ধা সন্ন্যাসাবস্থায় রহিয়াছে। আজ আমি তাহাদের যোগবল পরীক্ষা করিব—দেখিব, সন্ন্যাসাবস্থায় রহিয়া তাহারা কত দূর চিত্তসংযম করিতে সমর্থ হইয়াছে।' শঙ্কর ভবানীর প্রস্তাবে সম্মত হইলে, চারি সিদ্ধা নিমন্ত্রিত হইয়া শঙ্করভবনে উপস্থিত হইলেন।

'চারি সিদ্ধা মণ্ডলী করিয়া ভোজনে বসিয়াছেন—মা ভবানী, ভুবনমনোমোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বয়ং অন্নপরিবেষণে নিযুক্ত হইলেন। নারীর রূপ দেখিলে কি জানি মনে কোনরূপ বিকার জন্মে, এই আশঙ্কায় সিদ্ধাগণ নতমস্তকে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মা ভবানী, তাঁহাদিগকে সুবর্ণকটরাপূর্ণ পানীয় জল প্রদান

করিয়াছিলেন—পরিবেষণরতা নতাননী ভুবনমোহিনী ভবানীর রূপ, সেই সুবর্ণ কটরার স্থির ও স্বচ্ছ বারিবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইল। সিদ্ধাগণ অতর্কিতভাবে সেই ভুবন-মনোমোহিনীর প্রতিবিম্বিত রূপ দেখিয়া ফেলিলেন—শতচেষ্টা করিয়াও তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে :পারিলেন না। গোরক্ষনাথ, মা ভবানীর রূপ দেখিয়া ভাবিলেন—আহা, আমি যদি ইঁহার মত জননী পাইতাম, তাহা হইলে আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইত। কিন্তু অপর তিন সিদ্ধার মন, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে কখন চঞ্চল ও বিচলিত হইয়া গেল, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না।

'মীননাথ মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করিলেন—যদি আমি এইরূপ নারী প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে বেশ রঙ্গ-রসে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিই। ভবানী তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া, তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট করিয়া কদলী-পাটলে ষোলশত নারীসহ কালযাপন করিবার অভিসম্পাত প্রদান করিলেন।

'হাড়িফা মনে মনে চিন্তা করিলেন—হাড়ি-কর্ম্ম করিয়াও যদি এমন সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গ লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেও আমি নিজকে ধন্য জ্ঞান করিব। মা ভবানী এই নিমিত্ত, তাঁহার হাতে ঝুড়ি-কোদালি দিয়া তাঁহাকে এই মেহারকুলে তোমার পশুশালায় হাড়ি-কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। এইরূপে কালুফাও অভিশপ্ত হইয়া রাড়ার সহরে বাস করিতে আদিষ্ট হইলেন।

"তাই বলিতেছি,—ঐ হাড়ি তোমার পশুশালায় মা ভবানীর অভিশাপবশে হাড়ি-কর্ম্মে নিযুক্ত রহিলেও, প্রকৃত হাড়ি নয়। উঁহার নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান রহিয়াছে—তোমাকে উঁহারই নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। জালন্ধরী হাড়িফাই তোমার দীক্ষাদানের বিধি-নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধ যোগী—অপর কেহ নহে।"

দশম পরিচ্ছেদ

'প্রদীপ নিবিলে বাপু কি করিবে তৈলে।
আইল বান্ধিলে কি বা ফল জল টুটি গেলে'॥
'আমি রাজা যোগী হব তার অধিক নাই।
এসুখ সম্পদ আমি এড়িমু কার ঠাঞি'॥

গোপীচন্দ্রের বৈভব—ময়নামতীর উপদেশ

গোপীচন্দ্র এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলেন—হাড়িফার পূর্ব্ব-কথা সম্পূর্ণরূপে তাহার কর্ণগোচর হইল না। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি জননীকে বলিলেন—'আপনার মনে পূর্ব্বাবধি যদি এই অভিপ্রায় ছিল, তবে আপনি অদুনা পদুনা প্রভৃতির সহিত আমার বিবাহ দিলেন কেন? আমার এই নয়বুড়ী রাণী, অসংখ্য দাসদাসী—আমি এখন কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব!'

'আমি বাইশ-দণ্ডের রাজা। চল্লিশ জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা আমায় কর প্রদান করেন। আমি আজ্ঞা করিবামাত্র, বাহাত্তর লক্ষ পদাতিক সৈন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসিবে। মহা মহা যোদ্ধা, আঠার উজীর, বাষট্টী নাজির, তেষট্টি সওদাগর আমার ইঙ্গিতমাত্র সশস্ত্রে প্রস্তুত হইয়া আমার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইবে। আবশ্যক হইলে এইমাত্র ঢাল-তরবারী হস্তে বিরাশী হাজার, ধনুর্ব্বাণ

হস্তে নয় হাজার এবং সলিতা-বন্দুক লইয়া বহুতর সৈন্য ও অশ্বারোহী রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিবে। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে এত সৈন্য-সামন্ত কি হইবে?

'অশ্বশালায় আমার নয়লক্ষ 'হংসরাজ' ঘোড়া নিয়তই হ্রেষারবে আমাকে বহন করিয়া গৌরবান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত করিতেছে—হস্তিশালায় আশী হাজার হস্তী নিয়তই সুসজ্জিত রহিয়া বৃংহণ রবে আনন্দ বিঘোষিত করিতেছে। গঙ্গাবক্ষে বত্রিশ কাহন সুসজ্জিত নৌকা সর্ব্বদা আমার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে মৃদুমন্দ নৃত্য করিতেছে। যোড়-মন্দিরে 'সাহেমানি' দোলা আমার সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্য সুসজ্জিত ও সুচিত্রিত হইয়া পড়িয়া আছে। এতদ্ব্যতীত, আমার এই রাজপুরী মধ্যে পঞ্চমন্ত্রী অগণিত কর্ম্মচারী ও পরিচারকবৃন্দ, আমার সেবাপরিচর্য্যা করিবার জন্য নিয়তই উদ্যত রহিয়াছে—আমি এ সকল পরিত্যাগ করিয়া কোন্ সুখে, এই তরুণ বয়সে সন্ন্যাস অবলম্বন করিব?

'অট্টালিকার মধ্যে রহিয়াও রাজ-সভায় আমার মস্তকোপরি এখনও সুবর্ণচ্ছত্র শোভা পাইতেছে। কিন্তু দেশে দেশে ঘুরিয়া দারুণ রৌদ্রে মস্তক পুড়িয়া গেলেও কেহ ছায়া প্রদান করিবে না—বর্ষার জলে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইলেও কেহ আশ্রয় প্রদান করিবে না—তবে আমি কোন্ সুখে, কোন্ আশায় বুক বাঁধিয়া এমন সুখের নিবিড়

আশ্রয় সুবর্ণময় পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক পথের ভিখারী হইয়া দেশান্তরিত হইব' ?

ময়নামতী বলিলেন—'বৎস, এ সংসার অনিত্য, চক্ষু মুদ্রিত করিলেই সমস্ত অন্ধকারময় হইয়া যাইবে। এই যে ইষ্ট-মিত্র, মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগিনী—ইহারা কেহই কাহারও নহে। মৃত্যুকালে কেহই তোমার সঙ্গে যাইবে না। তুমি যে এই সুন্দর দেহের গৌরব করিয়া বেড়াইতেছ, এই দেহই ত ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এই যে ধন জন আপনার বলিয়া অধিকার করিতেছ—এ সকলও ত কোথায় পড়িয়া রহিবে ! ফলতঃ, জন্মকালে এই সংসারে যেমন রিক্তহস্তে নগ্নদেহে আগমন করিয়াছিলে, মৃত্যুকালে তেমনি রিক্ত ও নগ্নদেহে ফিরিয়া যাইবে—কেবল স্বোপার্জ্জিত পাপ আর পুণ্য সঙ্গে যাইবে। বৎস, তুমি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছ, যাহাতে তুমি ভবিষ্যতে তোমার কৃত অপকর্ম্মের ফলভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে ? তাই বলিতেছি, পূর্ব্বাহ্ণ হইতে সাবধান হও—নচেৎ, প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে তৈল প্রদানে কোন ফলোদয় হইবে না—জল নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে আইল বাঁধিলে কোন ফলোদয় হইবে না। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

'রমণীগণ চিরকাল আত্ম-সুখে সুখী। তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই—তাহাদের মায়ায়, তাহাদের রূপে

মুগ্ধ হইতে নাই। যে ব্যক্তি রমণীগণের মায়ায় মুগ্ধ, তাহার কোন কালেই পরিত্রাণ নাই। রাজার পাপে যেমন রাজ্য নষ্ট হয়, রমণীগণের পাপে তেমনি গৃহলক্ষ্মী বিনষ্ট হন। যে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীভূত হয়, তাহার শরীর মনুষ্য-চর্ম্মে আচ্ছাদিত রহিলেও, তাহার জীবন কুকুরের ন্যায় হেয় ও ঘৃণিত। তুমি স্ত্রীগণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিও না—অমরত্ব লাভের এই শুভ সুযোগ পরিত্যাগ করিও না। সময় আগত—যম তোমার প্রাণ হরণ করিবার জন্য নিয়ত সতর্ক ও প্রস্তুত রহিয়াছে। আমি তাহাকে কত 'ভেটঘাট' দিয়া, কত স্তোকবাক্য বলিয়া আপাততঃ নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছি। একদিন তুমি যখন 'টঙ্গীর' উপর বধূরাণীগণের সহিত পাশা ক্রীড়ায় রত ছিলে, সেই সময় যম তোমার প্রাণ হরণ করিতে আসিয়াছিল—আমি তোমার অশ্বশালায় তোমার চড়িবার প্রিয় তুরঙ্গমটি দিয়া তাহাকে সেদিন নিরস্ত করিয়াছি। সেই ঘোড়া অশ্বশালায় তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আর একদিন যম এইরূপ তোমার প্রাণহরণ করিতে আসিয়াছিল, সেদিনও তাহাকে বিবিধ উপঢৌকনে নিবৃত্ত করিয়াছি'।

গোপীচন্দ্র, জননীর নিকটে যমের উপঢৌকন-প্রীতির কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, 'তবে মা, আপনি এত চিন্তিত হইতেছেন কেন? আমার পিতার ভাণ্ডারে চৌদ্দরাজার ধন সঞ্চিত রহিয়াছে—আমার নিজের উপার্জ্জিত

ও বহুতর রজতকাঞ্চনে ভাণ্ডারগৃহ পরিপূর্ণ রহিয়াছে—চারি বধূরাণীর চারিগোলা ধান্য সঞ্চিত রহিয়াছে—যমকে এ সমস্তই উপঢৌকন দিলে ত তিনি নিশ্চয়ই মহাসন্তুষ্ট হইয়া আমার সামান্য প্রাণের লোভ পরিত্যাগ করিবেন।'

ময়নামতী, অল্পবুদ্ধি গোপীচন্দ্রের কথায় মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—'যমকে যদি অর্থ দিয়া নিবৃত্ত করা যাইত, তাহা হইলে কি আর তোমার জনকের মৃত্যু হইত ? যমরাজ ধনের কাঙ্গাল নহেন—তিনি রাত্রি দিন এই তিন ভুবন সমগ্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—সময় বুঝিলে তিনি কখন কিরূপে আসিয়া কাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন, তাহার স্থিরতা নাই'।

ময়নামতীর কথা শুনিয়া তরলমতি গোপীচন্দ্র মনে মনে এক পরামর্শ স্থির করিয়া বলিলেন—'আচ্ছা, যম যদি সত্য সত্যই বাড়ীতে আসিয়া প্রাণ হরণ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমি পূর্ব্ব হইতেই তাহার যথোচিত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিব। লৌহ-ঘর, লৌহ-বাসর প্রস্তুত করিয়া পুরীর দশদিকে লৌহময় জাল আচ্ছাদন করিয়া রাখিব। নিষ্কুষিত শাণিত অসি হস্তে সেই লৌহময় গৃহের চতুষ্পার্শ্বে আশীহাজার সৈন্য দিবারাত্র প্রহরিরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিব। যমের আগমনসংবাদ পাইবামাত্র তাহারা তাহার নিকটে অগ্রসর হইয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিবে। সুতরাং সেই যম, ভয়ে ভয়ে আমার

লৌহময় কক্ষের ত্রি-সীমায় কথনই আগমন করিতে সাহসী হইবে না। অথবা, যমকে 'লাল-টঙ্গীর রুয়া'-সংযুক্ত শাল উপঢৌকন দিয়া ভুলাইয়া দিব এবং সুযোগক্রমে তাহার প্রাণসংহার করিয়া তাহার নিকট হইতে বার রাজার ধন কাড়িয়া লইব'।

অপরিণতবুদ্ধি গোপীচন্দ্রের এইরূপ হাস্যজনক প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ময়নামতী বলিলেন—'বৎস গোবিন্দাই, তুমি নিতান্তই বালক; তুমি জান না, যম সাক্ষাৎভাবে কথন কাহারও নিকটে উপস্থিত হন না—অদৃশ্যভাবে আসিয়াই প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যান। সুতরাং, তুমি তাঁহাকে কেমন করিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে পারিবে? যমরাজ কথন চিলরূপে আসিয়া বাজ-পক্ষীর ন্যায় খর-দৃষ্টিতে নেত্রপাত করেন এবং অবশেষে মক্ষিকারূপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন। মনুষ্যের আয়ুশেষ হইলে যমরাজ তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন—ইষ্টমিত্র, মাতাপিতা, ভ্রাতাভগিনী যতই তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকুক না কেন, কেহই কিছু করিতে পারিবে না। তখন তাহাদের রোদন ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

'ভগিনী ভাই ভাই বলিয়া,গৃহিণী হায় হায় বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিবে। অন্ধ বৃদ্ধ তাহার শেষজীবনের একমাত্র অবলম্বন উপার্জ্জনক্ষম পুত্ররত্ন হারাইয়া দ্বারদেশে লুটাইয়া কাঁদিবে—শূন্য পুরীতে অন্ধ বৃদ্ধকে কে অন্নজল দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে? ভ্রাতাভগিনী মাত্র আড়াই প্রহর

কাঁদিয়া যে যাহার বাড়ী চলিয়া যাইবে। শঙ্খ-সোণা দিয়া বিবাহ করিয়া যে নারী গৃহে আনিবে, বড়ই ভক্তিমতী ও সৎকুলজাতা হইলে, না হয় তুই চারিদিন কাঁদিবে। ইষ্টকুটুম্বগণ গৃহ হইতে যাবৎ শব বহিষ্কৃত না হয়, তাবৎ ক্রন্দন করিবে—কিন্তু গর্ভধারিণী জননীর কি ক্রন্দনের সীমা আছে? যে, গর্ভে ধরিয়া অকথ্য গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, পুত্রের জন্য তাহার শোক যাবজ্জীবন সমভাবেই প্রবল থাকে। বৎস, আমার আর পুত্রকন্যা নাই—তুমিই আমার একমাত্র সন্তান। এইমাত্র দ্বাদশবর্ষ সন্ন্যাস কবিলে চিরকালের জন্য অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে। সেই জন্য, তোমায় আমি এত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। তুমি দীক্ষা লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কর—যে যম তোমার প্রাণ হরণ করিবার জন্য নিয়ত উন্মুখ রহিয়াছে, তাহার মুখে ছাই পড়ুক'।

একাদশ পরিচ্ছেদ

'না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর ।
কার লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর ॥'
'ভিক্ষা মাগিয়া প্রিয়া রান্ধিয়া দিব ভাত ।
ছাড়িয়া না দিমু তোক্ষা শোন প্রাণনাথ ॥'

গোপীচন্দ্র ও মহিষীগণ

রাজা গোপীচন্দ্র নিতান্ত বিষণ্ণমনে একাকী বিলাসকক্ষে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গভীরচিন্তাসাগরে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রধানা মহিষীচতুষ্টয়, অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল করিয়া ধীরমন্থর গতিতে তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহিষীগণের রূপের তুলনা নাই—প্রত্যেকেই এক একটি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র। তদুপরি, তাঁহাদের প্রসাধনকৌশলে, তাঁহাদের উজ্জ্বল রূপ উজ্জ্বলতর হইয়াছে—বস্ত্রালঙ্কারাদির সুষ্ঠু সন্নিবেশে তাঁহাদের স্বভাবজাত অতুলনীয় সৌন্দর্য্য শতসহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অদুনা, বাইশ লক্ষ কড়ি মূল্যের মেঘনাল শাড়ী পরিধান করিয়াছেন; পদুনা এক বহুমূল্যবান্ বস্ত্র পরিধান করিয়া কোমরবন্ধ আঁটিয়া দিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার কটীদেশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া 'সুন্দীবেতের' মত দোদুল্যমান হইতেছে। রত্নমালা তসর কাপড় পরিধান করিয়াছেন—এই কাপড় পরিধান করিলে অন্ধকার গৃহও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কাঞ্চনমালা

'খিরবলী' বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনার অনিন্দনীয় রূপকে অধিকতর সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহারা সকলেই হস্তযুগলে রাম-লক্ষ্মণ দুই মুঠ শঙ্খ পরিধান করিয়াছেন। এইভাবে মহিষীচতুষ্টয়, রাজা গোপীচন্দ্রের চিত্তবিনোদন করিবার জন্য, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহাকে সন্ন্যাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য, অপূর্ব্ব সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া হেলিয়া দুলিয়া তাঁহার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গোপীচন্দ্রের কপোলবিন্যস্ত বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা সকলেই একবারে নিদারুণ শোকে মুহ্যমানা হইয়া পড়িলেন এবং রাজার চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর তাঁহারা বলিতে লাগিলেন :—

'শুনিতেছি, আপনার জননী আমাদের সর্ব্ববিধ মায়া পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে সন্ন্যাস লইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিতেছেন। একথা সত্য হইলেও কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। কিন্তু আজ আপনার এই চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের সেই অসম্ভব কথাও সত্য সত্যই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে, এখন আর কোন দ্বিধা বোধ হইতেছে না।

'আমরা যখন নিতান্ত শিশু—আপনি তখন বালক। আমরা তদবধি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এতকাল

সুখস্বাচ্ছন্দ্যে একত্র বাস করিয়া সবে মাত্র যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছি। এতদিন শিশুমতি ছিলাম, সংসারের ভালমন্দ কিছুই বুঝি নাই ; এখন, যেমন সংসারে প্রবিষ্ট হইব, এমন সময়ে এই চির-বিচ্ছেদ আমরা কোন্ প্রাণে সহ্য করিব ? যদি দেশান্তরে যাইবারই আপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে আমরা যখন পিতৃগৃহে শিশু ছিলাম, তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ত আপনাকে ও আমাদিগের কাহাকেও এই অনন্ত বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইত না। আমরা আপনার শৈশবকালের বন্ধু ও খেলার সাথী। আপনি স্বহস্তে আমাদিগকে কত আদর করিয়া কতরূপে প্রসাধন করিয়াছেন ; অভ্রের কঙ্কই ও লক্ষ তঙ্কার 'জাদ' দিয়া কেশ বন্ধন করিয়া দিতেন—লক্ষ তঙ্কার গোঁপা পিঠে দোলাইয়া নিজ হস্তে কপালে সিন্দুর অঙ্কিত করিয়া দিতেন। বাইশ কাহন কড়ির মেঘনাল শাড়ী দিয়াছেন—পায়ে সোণার নপূর দিয়া আমরা ঝুমুর-ঝামুর হাঁটিয়া বেড়াইতাম, আপনি তাহা শুনিয়া কত আনন্দিত ও আত্মহারা হইতেন—এ সকল সুখময়ী স্মৃতি-কথা কি আমরা কখন ভুলিতে পারি ? আপনি আমাদিগকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন—এখন কি সে সবই লুপ্ত হইল ? আপনি কেমন করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন—আমরা আপনার ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদেই যে জীবনহারা হইয়া পড়িব, তাহা কি আপনি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না !

'কত কষ্টে এই 'শীতল মন্দির' প্রস্তুত হইল। আপনি না রহিলে এই ঘর শূন্য পড়িয়া রহিবে—এই স্বর্ণপর্য্যঙ্কের দুগ্ধফেননিভ শয্যা ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে।

'আপনি যদি সত্য সত্যই গৃহত্যাগ করিবেন, তাহা হইলে আমরাও আপনার সহিত গৃহত্যাগ করিব। স্বামী ভিন্ন নারীগণের গত্যন্তর কি? আপনি যোগিবেশ ধারণ করিলে, আমরা যোগিনী-বেশে আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব, এবং আপনার জন্য একবেলা অন্ন রন্ধন করিয়া দুইবেলা মহাযত্নে আপনাকে আহার করাইব। আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত হইলে আমরা আপনাকে ক্রোড়ে করিয়া লইব। আপনি যখন রৌদ্রে পিপাসায় কাতর হইবেন, তখন আমরা শীতল বারি অন্বেষণ করিয়া পান করাইব। আপনি যখন দূরদেশে পদব্রজে প্রান্তর কান্তার অতিক্রম করিবেন, তখন আমরা আপনার সঙ্গে রহিয়া নানাবিধ আলাপে আপনার চিত্তবিনোদন করিতে রত থাকিব এবং সন্ধ্যা হইলে আপনার হস্তপদ সংবাহনে আপনার দেহের ক্লান্তি অপনোদন করিব। বৃক্ষতলেও আমরা আপনার জন্য শীতল পাটী বিছাইয়া দিব এবং হেলান দিবার জন্য বালিস যোগাইব। গ্রীষ্মকালে আপনার ঘর্ম্মসিক্ত' বদনমণ্ডলে পাখার বাতাস করিব এবং মাঘ মাসের শীতে আপনার অঙ্গ ঘেসিয়া আমরা আপনাকে শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিব।

'বনে হরিণ হরিণী একত্র বাস করে—প্রেমবশে কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। তাহারা সমস্ত দিন বনে বনে চরিয়া বেড়াইয়া সন্ধ্যার সময় হরিণ অগ্রে অগ্রে এবং হরিণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আপনাদের আশ্রয়াভিমুখে চলিয়া যায়। আমরাও তদ্রূপ আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুসরণ করিয়া বেড়াইব; আপনার নিকটে রহিলে আমরা সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইব। আপনার এই অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে—আমরা আজ আপনার নিকটে পূর্ণ দ্বাদশবর্ষকাল দিবারাত্র একত্র রহিয়াছি, ক্ষণেকের জন্যও বিচ্ছেদ অনুভব করি নাই। এখন আমাদিগকে আপনি ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় করিলে, আমরা আপনাকে ত্যাগ করিব কেন?'

গোপীচন্দ্র এতক্ষণ একবারে নীরব রহিয়া রাণীগণের শোকোচ্ছ্বাস ও সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের স্বামিভক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণচ্ছলে বলিলেন, 'তোমরা সকলেই অপূর্ব্ব রূপসী—'বংশহরি' গুয়া ভক্ষণ করিয়া তোমাদের দন্তপংক্তি সোলার ন্যায় শুভ্র হইয়াছে; কথা কহিলে দন্তশ্রেণী যেন ঝল্‌মল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে—অধর-পল্লব পদ্মপত্র মনে করিয়া ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া উঠে। আমি কন্থাধারী সন্ন্যাসী হইব। তোমরা যদি এমন রূপ লইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াও, তাহা হইলে দশ ঘরের গৃহস্থ

ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই অপবাদ দিয়া বলিবে, আমি একজন রমণী-চোর সন্ন্যাসী, কোথায় কাহার স্ত্রীরত্ন হরণ করিয়া আনিয়াছি। সুতরাং, আমি গৃহস্থ রমণীগণকে, মাতৃ-সম্বোধন করিয়া ভিক্ষা চাহিলেও এই রমণীচোরকে কোন গৃহস্থই আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইবে না—পরন্তু, দূর্-দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।'

রাণীগণ গোপীচন্দ্রের এই অসঙ্গত আশঙ্কার কথা শুনিয়া বলিলেন—'আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য; আমরা কিন্তু আপনার মতই 'রাম-খিলিকা', ডোর-কৌপিন পরিধান করিব। আমাদের সম্মুখের ছয়টি করিয়া দন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমাদের পিঠভরা মাথার কেশ মুড়াইয়া দিব এবং হাতে তুম্বা, গলায় কন্থা ঝুলাইয়া আপনার পিছু পিছু ভিক্ষা মাগিয়া খাইব—তখন আমাদের সেই কদাকার রূপ দেখিয়া কেহ আপনার প্রতি সন্দিহান হইবে না। সুতরাং, আপনার আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কোন আপত্তিই চলিবে না। আমরা আপনার সঙ্গে যাইবই যাইব—কোনরূপ বাধাবিঘ্ন আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না।'

গোপীচন্দ্র, রাণীগণের তাঁহার সহিত গৃহত্যাগের এরূপ দৃঢ়-সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া মনে মনে তাঁহাদের স্বামি-ভক্তির অশেষ প্রশংসা করিয়া বাহ্যতঃ পুনরায় বলিলেন—'আমি কত বন কত জঙ্গল ঘুরিয়া বেড়াইব; সেখানে বড় বড়

বাঘ বিচরণ করে—সেখানে তোমরা সঙ্গে গেলে, বাঘে ভক্ষণ করুক না করুক, প্রাণে বধ করিয়া ফেলিবে—সুতরাং এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে গিয়া অনর্থক প্রাণবিসর্জ্জন দিবার প্রয়োজন কি ?'

গোপীচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া রাণীগণ সকলেই একসঙ্গে বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—'স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী রহিলে, কি স্ত্রীকে বাঘে ধরিতে পারে ?—আপনার এ সকল অসঙ্গত কথা কে প্রত্যয় করিবে—আমাদিগকে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিবার জন্য ও-সকল কেবল আপনার ওজরমাত্র। আমাদিগকে বাঘে ভক্ষণ করুক না কেন, আমরা তাহাকে কি ভয় করিয়া আছি ? অকলঙ্ক দেহে স্বামীর পদতলে মৃত্যু ঘটিবে—ইহা ত আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা—আমরা ত ইহাই চাই।

'আপনি বৃহৎ বটবৃক্ষ—আমরা লতিকাসদৃশ। আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া—আপনাকেই বেষ্টন করিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া আপনার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া যাবজ্জীবন অবস্থান করিব। আমরা আপনার রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া পড়িয়া রহিব—আপনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া কোথায় পলাইয়া যাইতে পারিবেন ? আপনি পূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, এরূপভাবে আপনার স্বচ্ছন্দবিহারে আমরা কেহই বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হইতাম না।

'আমরা মাতাপিতা ভ্রাতাভগিনী সব পরিত্যাগ করিয়া

শৈশবাবধি কেবল আপনারই মুখ চাহিয়া জীবিত রহিয়াছি। যদি আমাদের যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইত—মাথার কেশ শুভ্র হইত, মুখের দন্ত স্খলিত হইত, তখন যদি আপনি দেশান্তরিত হইতেন, তাহা হইলেও মনকে কতক প্রবোধ দিতে পারিতাম। আমরা যদি কোলে একটি সন্তান পাইতাম, তাহা হইলেও, তাহার মুখ চাহিয়া কতকটা দুঃখ ভুলিতে পারিতাম। তাহাকে লালনপালন করিয়া আমাদের দুঃখের কাল কাটাইয়া দিতাম—আপনার মস্তকের রাজচ্ছত্র তাহার মস্তকে ধরিয়া রাজার মা সাজিয়া মনকে প্রবোধ দিতাম'।

এই কথা শুনিয়া গোপীচন্দ্র বলিলেন—'আমি তোমাদের অভিপ্রায় মত সঙ্গে সঙ্গে কোথায় পুত্র পাইব? পুত্র বৃক্ষের ফল নয় যে পাড়িয়া দিব—'চিনিচাঁপা' কলা নয় যে, দুধে মাখিয়া খাইবে। তোমাদের ভাগ্যে পুত্র নাই—তা আমি কি করিব'?

গোপীচন্দ্রের এরূপ কর্কশ উত্তর প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহারা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—'আপনি জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, আপনার নিকটে আমরা আর কি বলিয়া আমাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিব? আমরা আপনার যুবতী ভার্য্যা; আমাদের আপনিই একমাত্র অবলম্বন ও গৌরবস্থল। রাজার গৌরব যেমন হাতী ঘোড়া, সাধু সওদাগরের গৌরব যেমন নৌকা, বৃদ্ধ পিতার গৌরব

যেমন উপার্জ্জনক্ষম পুত্র, সপত্নী-বিদ্বেষ্টার গৌরব যেমন বশীকরণ মন্ত্র বা ঔষধ, জমীদারের গৌরব যেমন ধন ও জন— তদ্রূপ আমাদের এই চারি ভগিনীর আপনিই একমাত্র গৌরবস্থল। আপনি এই যৌবনকালে কেন যোগী হইবেন? আপনার জননীর ব্যবস্থা সমস্ত বিপরীত—গোড়ার গাছ কাটিয়া শিরোদেশে জল ঢালিলে কি ফলোদয় হইবে? আপনার নিজের কি এতটুকু বিচারবুদ্ধি নাই যে, আপনি অন্ধের মত অযথা আদেশ প্রতিপালন করিতে গিয়া আমাদের এবং আপনার নিজের এই বিষম অনর্থপাত ঘটাইতে অগ্রসর হইয়াছেন? যিনি হাড়ির সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা ক'ন, হাড়ির সঙ্গে বসিয়া তাম্বূলচর্ব্বণ করেন, তাঁহার কথার কি মূল্য আছে—না, তাঁহার কথায় রাজ্য-ভোগ ত্যাগ করিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগিয়া উদরপূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিতে হয়? আমরা আর কি বলিব? আমাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যিনি ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, প্রভু নিরঞ্জন তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রেই বিনষ্ট করুন—ইহাই আমরা কায়মনোবাক্যে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি'।

গোপীচন্দ্র মহিষীগণের হৃদগত ভাব বুঝিবার জন্য ছলনা করিয়া বিরুদ্ধভাবে নানারূপ কথা কহিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা তাঁহার প্রতি সত্য সত্যই একান্ত অনুরক্ত, তখন তাঁহার দ্বিধা করিবার আর কিছুই কারণ রহিল না। জননীর কথায়, তিনি সন্ন্যাস

লইবার বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না—নানারূপ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এক্ষণ মহিষীগণের বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তিনি হৃদয়ে বলসঞ্চয় করিলেন—তিনি জননীকে দৃঢ়ভাবে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

'আবুদ্ধিয়া গোপীচাঁদ বুদ্ধি নাহি দিলে।
সর্ব্বধন হারাইলা চারি নারী কোলে'॥
'মুঞি বুঝ রাঁড়ির বেটা গেছে সন্ন্যাসী হয়্যা।
আইজ পতি আছে সুন্দর বধূ পায়্যা'॥

ময়নামতীর তিরস্কার

গোপীচন্দ্র, পাত্রমিত্র সহ রাজসভা আলোকিত করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। ব্রাহ্মণ সজ্জন দুই পার্শ্বে সারি সারি বসিয়া আছেন—কর্ম্মচারিগণ, রাজার নিকটে যে যাহার কার্য্য লইয়া অনুমোদনাদি করিয়া লইতেছে। বীরসিংহ ভাণ্ডারী রাজ্যের যাবতীয় হিসাব নিকাশ রাজসমীপে উপস্থাপিত করিতেছে। অসংখ্য লোকজনের সমাগমে রাজসভা গম্ গম্ করিতেছে। এমন সময়ে স্বয়ং ময়নামতী সেই রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রৌপ্যখট্টায় পদরক্ষণ করিয়া সুবর্ণ-খট্টায় উপবেশন করিলেন।

ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে সংসারের অনিত্যতা এবং তাঁহার আশু যমের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া অমরত্ব লাভের জন্য, সন্ন্যাস গ্রহণের আবশ্যকতা যেরূপ বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইয়াছিল— গোপীচন্দ্র আজ প্রভাতে নিশ্চয়ই সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ কি ? বধূরাণীগণের সহিত সাক্ষাৎ ও রাত্রিযাপনের পর সে সমস্ত উপদেশ একবারে বিস্মৃত

হইল—রমণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সে এমন অমূল্য জীবন অকুণ্ঠিতচিত্তে বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হইল! ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে যথাপূর্ব্ব নির্ব্বিকারচিত্তে রাজকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার এত উপদেশ, এত তর্কবিতর্ক দ্বারা তাঁহার জ্ঞান ও চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা, ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় সবই বৃথা হইল!

কিন্তু ময়নামতী নিরাশ হইলেন না—তিনি দিব্যনেত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন—সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে, তাহার একমাত্র বংশধর পুত্রের মৃত্যু অনিবার্য্য। সুতরাং, তিনি গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাসাবলম্বন করিবার জন্য তীব্রকোমল সর্ব্ববিধ চেষ্টাই অনাচরিত রাখিতে পারিবেন না। তাঁহাকে মৃদুভাবে মধুর উপদেশ দানে কোন ফলোদয় হইল না—সুতরাং, তিনি তীব্রভাবে ভর্ৎসনা দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে প্রয়াসী হইলেন। তিনি সভামধ্যেই গোপীচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

'বৎস গোপীচন্দ্র, তুমি এই বিধবার সর্ব্বস্ব ধন। ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ করুন, তুমি চিরজীবী হও—সমুদ্রসৈকতে যত বালুকা আছে, তোমার তত পরমায়ু হউক। আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি আমার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ এবং এই নিমিত্ত আমি বড়ই আশা করিয়া আসিয়াছিলাম—তোমায় দেখিব, তুমি সন্ন্যাস-গ্রহণ জন্য প্রস্তুত হইয়া আছ। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে, তুমি আমার সমস্ত উপদেশ পদদলিত

করিয়া, অতি হেয় ও তুচ্ছবোধে অবহেলা করিয়া, কামিনী-কাঞ্চনের মোহে অঙ্গ ঢালিয়া যথাপূর্ব্ব আত্ম-বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছ !'

গোপীচন্দ্র জননীর এই কথা শুনিয়া, তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—'মা, আপনাকে আমি আর কি বলিব ? গর্ভধারিণী জননী হইয়া যে, সন্তানের প্রতি এমন নিষ্ঠুর হইতে পারে, তাহা কাহারও বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হইবে না। পৃথিবীর সকল সন্তানের জননীই, সন্তানকে বিষয়-বৈভব ভোগ করিয়া স্বচ্ছন্দে গৃহবাস করিবার জন্য আশীর্ব্বাদ করেন, পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া আনন্দে দিনযাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন,—আর আপনি নিত্য কেবল আমার গৃহত্যাগের কথাই বলিতেছেন—রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে, যোগী ভিক্ষুকের বেশে দেশান্তরিত হইতে বলিতেছেন—আপনি আমার প্রতি কেন এরূপ শত্রুতাচরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন ?'

গোপীচন্দ্রের এই সকল কথা শুনিয়া ময়নামতী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার গোপীচন্দ্র ত এরূপ মুখর ছিল না—তাঁহার সমক্ষে ত সে কখনও এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ বা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করে নাই। বধূগণই যে তাঁহার নিরীহ সন্তানকে এরূপ চপল ও মাতৃদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে—তাহার অমৃতময়ী ও অবিচলিত মাতৃভক্তিকে বিষাক্ত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে—এ কথা তিনি স্পষ্টরূপে

বুঝিতে পারিলেন এবং অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—

'গর্ভছাড়া' পুত্র, তুমি কেন জন্মিয়াই মরিয়া যাও নাই। তুমি মনুষ্যকুলে জন্ম না লইয়া যদি চালে চাল-কুমড়া হইয়া জন্মিতে, তাহা হইলেও লোকে ভাগ করিয়া খাইয়া বাঁচিত। দুর্ব্বুদ্ধি গোপীচান্দ, তোমার কি বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি নাই—রমণীর কথায় সবই হারাইতে বসিয়াছ! তোমাকে বুঝান 'বর্ব্বরের চাষের' তুল্য নিতান্তই অসম্ভব। তুমি ঘরে থাকিলে—তুমি নষ্ট হইবে, রাজ্য নষ্ট হইবে, ছয় কুড়ী রাণী বিধবা হইবে—দেশময় হাহাকার পড়িয়া যাইবে। স্ত্রী হইয়া সাধ করিয়া হাতের লোহা খসাইয়া বিধবা হইতে চায়—এ যে ঘোরতর কলিকাল!

"কলির প্রভাবে ধর্ম্মনষ্ট হয়, রাজা বিচারবুদ্ধিহীন ও বিবেকজ্ঞানশূন্য হয়, শাস্ত্রীয় বাক্য ও আদেশ অবজ্ঞাত হয়। সন্তানে জনকজননীর আজ্ঞা অবহেলা করে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিয়া কেহ সম্ভ্রম প্রকাশ করে না—শিষ্য গুরুকে ভক্তি করে না, গুরু শিষ্যকে স্নেহ করে না। লোক ধনলোভে মহাপ্রাণীর বিনাশ ও রাজসভায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে। পত্নী স্বামীকে বঞ্চনা করিবে—সতীধর্ম্ম মিথ্যা হইয়া যাইবে। সত্য গেল, ত্রেতা গেল, দ্বাপর গেল—এখন এই সব কু-লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইতেছে, ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে।

"এই নশ্বর দেহের পরিণতি কি ?—অগ্নিতে দগ্ধ করিলে ভস্ম হইয়া যাইবে—জলে নিক্ষেপ করিলে মৎস্যের উদরে যাইবে—মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে কৃমি-কীটের আহার হইবে। সুতরাং, কোন দিকেই নিস্তার নাই। তাই বারংবার বলিতেছি যে, যথাসময়ে গুরু আশ্রয় গ্রহণ কর, বিষ্ণুদেহ প্রাপ্ত হইবে—জীবন ধন্য হইবে, নশ্বর দেহ পবিত্র ও অমর হইবে।"

ময়নামতীর এত ভর্ৎসনা, এত তত্ত্ব-কথা, এত উপদেশ-বাক্য, মোহান্ধ গোপীচন্দ্রের চিত্তকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারিল না! অতুল বৈভব, অতুলনীয় রূপসী পত্নীবৃন্দ—এ সকল ভোগের আয়োজন তিনি প্রত্যক্ষ ও উপভোগ করিতে কেবল আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি এ সকলের আস্বাদনে প্রলুব্ধ হইয়াছেন মাত্র—পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন কোথায়? সুতরাং, তৈলাক্ত দেহে আগন্তুক জল-বিন্দুর ন্যায়, ময়নামতীর উপদেশ তাঁহার হৃদয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে!

ভোগান্তে পরিতৃপ্তি বা বিতৃষ্ণা-জনিত বিরতি লাভ, সময়-সাপেক্ষ। যথাকাল সমুপস্থিত না হইলে, তৎপ্রাপ্তির অন্যবিধ উপায়ান্তর নাই। কিন্তু স্বভাবজাত বিষয় ও ভোগলিপ্সার প্রতি বিতৃষ্ণার উদ্ভব হইলে, তাহা কালাকালের অপেক্ষা রাখে না। পরন্তু, অকারণ বা

নামমাত্র কারণ আশ্রয় বা উপলক্ষ্য করিয়া অকালেই তাহার স্ফূরণ হইয়া থাকে।

এতদুভয়ের মধ্যে কোন হেতুই গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণের সহায়তা করিল না। ভোগান্তে পরিতৃপ্তি ও বিরতি বহুসময়সাপেক্ষ—ততদিন, ততদিন কেন, অতি অল্প কয়েক দিনও গোপীচন্দ্র অপেক্ষা করিবার পূর্ব্বেই হয়ত তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অথচ, তাঁহার হৃদয়ে এমন কোন বৃত্তির উদ্ভব হইতেছে না, যাহাতে তাঁহার কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি আশু বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। সুতরাং গোপীচন্দ্র, ময়নামতীর কথার সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ উত্তর না দিয়া, মৌনাবলম্বনে মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ময়নামতী গোপীচন্দ্রের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া উপায়ান্তর অবলম্বনে, তাঁহার মনকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তৃতীয় খণ্ড—সঙ্কল্প

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

'রাজারাণী নিবিড় খোঁপের কবুতর।
কেমনে ভাঙ্গিব জোড় দেখি লাগে ডর॥'
'আঁচলেতে ছিল প্রাণ এলাইয়া দিল।
রাজার শরীরে প্রাণ প্রবেশ করিল॥'

গোপীচন্দ্রের প্রাণহরণ ও প্রত্যর্পণ

ময়নামতী আপন আলয়ে ধ্যানস্থা হইয়া অবগত হইলেন, গোপীচন্দ্র যথাপূর্ব্ব রমণীর মোহে মুগ্ধ হইয়া বিলাস-কক্ষে রজনী অতিবাহিত করিতেছেন। গোপীচন্দ্রকে এত সদুপদেশ প্রদান করিয়াও তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তাঁহার সাধনা-লব্ধ মন্ত্রশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

গভীর নিশীথে, আপনার নিভৃত-কক্ষ মধ্যে ময়নামতী এক বিকট হুঙ্কার ত্যাগ করিবামাত্র, অন্ধকার গৃহ হঠাৎ আলোকিত হইল। হুঙ্কারের শব্দে যমালয় কম্পিত হইল—যমরাজ ত্রস্ত হইয়া চিত্রগুপ্তকে, এই অসময়ে যমপুরী কম্পনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চিত্রগুপ্ত 'খড়ি পাতিয়া' গণনা দ্বারা জানিলেন—ময়নামতীর হুঙ্কারে ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিয়াছে। যমরাজ এই কথা শ্রবণ করিয়া চিত্রগুপ্তকে ময়নামতীর নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধের কারণ অবগত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

যমরাজের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দূতগণ বিদ্যুদ্বেগে ময়নামতীর সমক্ষে উপস্থিত হইল এবং করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ময়নামতী যমদূত দেখিয়া বলিলেন—'রাজা গোপীচন্দ্র এখন রমণীগণ সহ বিলাস-কক্ষে আমোদপ্রমোদে মত্ত রহিয়াছে, আমার আদেশ, তোমরা এখনই গিয়া তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটন কর—তোমরা গোপীচন্দ্রের প্রাণ লইয়া চলিয়া যাও। এ কথা আমি রহস্যচ্ছলে বলিতেছি না—সত্যসত্যই বলিতেছি।'

দূতগণ কি করিবে?—'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজা গোপীচন্দ্রের বিলাস-কক্ষসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা কিয়দ্দূর হইতে দেখিল—রাজা গোপীচন্দ্র, রমণীগণ সহ দিব্য আমোদ-আহ্লাদে সময়ক্ষেপ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহারা ময়নামতীর আদেশ প্রতিপালন করিতে কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না—তাহারা তরুণ রাজা ও তরুণী রাণীগণকে দেখিয়া কাঁদিয়াই আকুল হইল—তাহারা একবারে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল! রাজা রাণী নিবিড় খোঁপের কবুতর-যুগলের ন্যায়, স্বচ্ছন্দমনে বসিয়া আছেন দেখিয়া, তাঁহাদের মধ্যে হঠাৎ এই দারুণ বিচ্ছেদ সংঘটন করিতে কিছুতেই সমর্থ হইল না। তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল—তাহারা পশ্চাদপসরণ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ময়নামতী ধ্যানস্থা হইয়া দূতগণের পলায়ন-ব্যাপার অবগত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ আপনার কায়াখানি সেই কক্ষে রক্ষিত করিয়া, ভ্রমর-বেশে উড়িয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। দূতগণ রাণীর ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল ; কিন্তু কতক্ষণ ? ময়নামতী তাহাদিগকে অর্দ্ধপথেই ধৃত করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক আপনার কক্ষে লইয়া আসিলেন। তদনন্তর তিনি যমদূতগণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—'তোদের এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, আমার সহিত প্রতারণা করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিস্। তোদের যমরাজ স্বয়ং আমার ভয়ে সর্ব্বদা কম্পমান থাকে, তোরা ত কোন্ ছার !'

দূতগণ তখন যোড়হস্তে কম্পান্বিত হইয়া বলিলেন— 'মা, আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আমরা সেই দিব্য সুন্দর তরুণ রাজকুমার ও রূপসী তরুণী মহিষীবৃন্দ দেখিয়া, তাঁহাদের এই বিলাসভোগের কালে বিচ্ছেদ সংঘটন করিতে কোনমতেই অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আহা, তাঁহারা সবে মাত্র সংসারের সুখভোগ আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—এমন সময়ে মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে, আমাদের মত যমদূতেরও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল ! মা, সেই জন্য আমরা তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটন করিয়া রাজার প্রাণ কাড়িয়া লইতে পারি নাই। আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করুন।

এখন আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।'

ময়নামতী, দূতগণের এই কথা শুনিয়া ক্রোধান্বিতা হইয়া বলিলেন—'ওঃ, তোমরা কত কপট মায়াই না জান! যমের শরীরে দয়া! যদি তোমাদের শরীরে দয়ার লেশ-মাত্র রহিবে, তবে তোমরা আমার প্রথম যৌবনে আমাকে বিধবা করিয়া, আমার স্বামীর প্রাণ হরণ করিয়াছিলে কেন? তোমাদের শরীরে আবার দয়া কোন্ কালে আছে?—তোমরা দুধের শিশুকে মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া আন—তোমাদের শরীরে আবার দয়া! যাও, আর কপটতা করিতে হইবে না; আমি যাহা আদেশ করিয়াছি, এই দণ্ডেই তাহা প্রতিপালন কর।'

যমদূতগণ পুনর্ব্বার গোপীচন্দ্রের শয়ন-কক্ষের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, রাজা গোপীচন্দ্র ও মহিষীগণ সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। যমদূতগণ উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া রাজার প্রাণ হরণ করিয়া একবারে যমালয়াভিমুখে যাত্রা করিল—ময়নামতীর নিকটে আর তাহারা ফিরিয়া আসিল না।

ময়নামতী আপন কক্ষে বসিয়া জানিতে পারিলেন, দূতগণ গোপীচন্দ্রের প্রাণ হরণ করিয়া যমালয়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। মনুষ্যের প্রাণ একবার যমালয়ে লইয়া গেলে আর নিস্তার নাই—কায়াটি সঙ্গে সঙ্গেই ভস্মীভূত হইয়া

যাইবে। কিন্তু ময়নার ত গোপীচন্দ্রের প্রাণ হরণ করিয়া তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করিবার অভিপ্রায় নহে—তাঁহার অভিলাষ, গোপীচন্দ্রকে শিক্ষা প্রদান করা। এই নিমিত্তই তিনি এই ক্ষণিক প্রাণ-হরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দূতগণ, ময়নামতীর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, গোপীচন্দ্রের প্রাণ লইয়া একবারে যমালয়াভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই নিমিত্ত ময়নামতী, তাড়াতাড়ি ভ্রমরের রূপ ধারণ করিয়া শূন্য-পথে দূতগণকে আক্রমণ করিলেন এবং গোপীচন্দ্রের প্রাণ কাড়িয়া আপনার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যমদূতগণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে যমালয়াভিমুখে পলায়ন করিল—আর ফিরিয়া চাহিতেও সাহসী হইল না।

অদুনা পদুনা মহিষীদ্বয় জাগরিতা হইয়া দেখিলেন, রাজার প্রাণহীন দেহ, নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে পড়িয়া আছে। এরূপ আকস্মিক বিপৎপাতে তাঁহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। রাণীগণের কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না যে, রাজার এমন সুগঠিত সুন্দর দেহ প্রাণশূন্য হইয়াছে। সুস্থ শরীরে নিদ্রা গিয়াছেন, ইহারই মধ্যে এই ব্যাপার—ইহা চক্ষে দেখিলেই বা কে বিশ্বাস করিতে পারিবে? রাজা শ্রমক্লিন্ন হইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন—এই আশঙ্কা করিয়া তাহারা তাঁহার কর্ণমূলে সজোরে আহ্বান-ধ্বনি করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন সাড়া নাই। অঙ্গে হস্তস্পর্শ করিয়া দেখিলেন, সমগ্র অঙ্গ কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন

হইয়া গিয়াছে—নাসিকায়ও শ্বাস বহিতেছে না। তখন অদুনা পদুনার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে—তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে!

মহিষীদ্বয় স্খলিতকেশা ও স্রস্তাঞ্চলা হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গলার লক্ষমুদ্রার গজমতিহার ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত করিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ময়নামতীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—'মাতা হইয়া রাক্ষসীর ন্যায় পুত্রের অমঙ্গল কামনা ও তাঁহার প্রতি অভিসম্পাত করিতেছিলেন—তাহার ফল হাতে হাতে ফলিল। এমন কি, একরাত্রিও নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হইল না! এখন ত সবই ফুরাইল; এইবার কাহাকে যোগী করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাইবে!' রাণীগণের ময়নামতীর বিরুদ্ধে এইপ্রকার নানাবিধ অনুযোগ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভাত হইল।

প্রভাতে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, রাজা গোপীচন্দ্র হঠাৎ নিদ্রিতাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া রাজার ইষ্টবন্ধু, পাত্র-মিত্র, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, প্রজা-সাধারণ সকলেই মহাশোকান্বিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল—অন্তঃপুরে রমণীগণ এবং পথে পথে বালকবৃন্দ ক্রন্দন করিতে লাগিল। মৃতপতি কোলে করিয়া অদুনা পদুনা তাঁহাদের কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন—

তাঁহাদের কাতর-ক্রন্দনে পাষাণও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এমন কি, পশুপক্ষী কুকুর শৃগালও শোক-সূচক করুণধ্বনি করিয়া সমগ্রদেশমধ্যে এক বিষাদের সুর জাগাইয়া তুলিল।

রাজা গোপীচন্দ্রের মৃতদেহের সৎকার করিতে হইবে—আর বিলম্ব করা চলিবে না। সুতরাং অচিরে ঘৃত চন্দন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইল এবং মৃত রাজাকে শ্মশানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল। মহিষীগণ সকলেই সহমৃতা হইবেন—তাঁহারা কেহই বিধবার দুর্ব্বিহ জীবন যাপন করিবেন না। তাঁহারা, যথারীতি প্রসাধিত ও সুসজ্জিত হইয়া ললাটে সিন্দূর লিপ্ত করিয়া রাজার সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং রাজার মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া লাজ ছড়াইতে ছড়াইতে শ্মশানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ মন্দিরা প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রের বাদন, শ্মশান-যাত্রার বার্ত্তা নগরময় ঘোষণা করিয়া দিল।

রাজা গোপীচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ ময়নামতীর নিকটে বধূরাণীগণ ইচ্ছা করিয়াই প্রেরণ করেন নাই। ময়নামতী কিন্তু, কোন সংবাদই অপরিজ্ঞাত নহেন—কেন না, তিনিই ত এই বিষাদময় করুণ অভিনয়ের একমাত্র অনুষ্ঠাত্রী ও পরিচালিকা। ময়নামতী অজ্ঞতার ভাণ করিয়া রাজ-বাটীতে কোনরূপ সংবাদ লইতে আগমন করেন নাই। এখন যখন রাজার মৃত্যু-সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—

নগরের মধ্য দিয়া প্রকাশ্য রাজপথে বাদ্যভাণ্ডসহ রাজার শব শ্মশানে নীত হইতেছে এবং বধূরাণীগণ সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজশব বেষ্টন করিয়া লাজ ছড়াইতে ছড়াইতে পদব্রজে যাইতেছেন, তখন লোক-লজ্জাবশতঃও তাঁহাকে বাহির হইয়া সংবাদ লইতে হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে যথাসময়ে সংবাদ প্রেরণ না করায় বধূরাণীগণের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

অগুরুচন্দনকাষ্ঠের চিতা সজ্জিত করিয়া তদুপরি মহিষীগণ রাজা গোপীচন্দ্রের শবদেহ ক্রোড়ে করিয়া উপবেশন করিলেন। শত শত কলসী ঘৃত চিতার উপর ঢালিয়া সকলে অগ্নি-সংযোগ করিবার পূর্ব্বে, চিতা বেষ্টন করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

দূর হইতে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া ময়নামতী বুঝিতে পারিলেন—এইবার চিতায় অগ্নি-সংযোগ করিবার আর বিলম্ব নাই। তখন তিনি পঞ্জিকাহস্তে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া চিতাসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সাতিশয় ব্যাগ্রভাবে বধূরাণীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'মা, তোমরা ক্ষান্ত হও—তোমরা অনলে দগ্ধ হইও না; আমি মন্ত্র ও যোগবলে তোমাদের মৃতপতির শরীরে এখনই জীবন

সঞ্চারিত করিয়া দিতেছি—তোমরা আমায় কি পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিতেছ, বল।'

অদুনা পদুনা প্রভৃতি মহিষীগণ, এই অদ্ভুত কথায় সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলেও ব্রাহ্মণের কথায় তাঁহারা যেন আকাশের চন্দ্র করতলে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ব্যগ্রভাবে বলিলেন—'যদি আপনি আমাদের মৃতপতির জীবন দান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আপনাকে অর্দ্ধ রাজ্য, অর্দ্ধ সিংহাসন দান করিব—রাজার দেহের পরিমাণে রাশি রাশি অমূল্য মণিমাণিক্য, রত্নমালা, রজতকাঞ্চন ঢালিয়া দিব। স্বয়ং রাজা আপনার চরণের দাস হইবেন—আমরা আপনার চরণের দাসী হইব। ইহার অধিক আমরা সঙ্গতভাবে আর কি প্রতিশ্রুতি করিতে পারি?—আপনি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক আমাদের স্বামীর জীবন দান করুন'।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, রাণীগণের প্রতিশ্রুতি শ্রবণ করিয়া সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—"তাহা হইলে তোমরা এই চিতার চতুষ্পার্শ্বে 'কানাথ' বেষ্টন করিবার ব্যবস্থা কর।" তদ্দণ্ডেই সেই স্থান কানাথ দিয়া বেষ্টন করা হইল—তন্মধ্যে কেবল চিতাশয্যায় শায়িত রাজার শব এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রহিলেন—রাণীগণ বা অপর কেহ, তাহার মধ্যে রহিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন না।

ময়নামতী যমদূতের নিকট হইতে গোপীচন্দ্রের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া অঞ্চলমধ্যেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন শবের নিকটে গিয়া অঞ্চল-বদ্ধ গোপীচন্দ্রের প্রাণ, 'এলাইয়া' দিবা মাত্র, শবে প্রাণ সঞ্চারিত হইল? ব্রাহ্মণরূপিণী ময়নামতী তখন হুঙ্কার ছাড়িলেন—রাজা সেই শব্দে, যেন নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইয়া চিতার উপরে উঠিয়া বসিলেন এবং পার্শ্বে অদুনা পদুনার জন্য নেত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এত ব্যাপার হইয়া গেল—গোপীচন্দ্র বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না! তিনি যেন রাজ-শয্যায় রাণীগণের সহিত একত্র নিদ্রা যাইতেছিলেন এবং এইমাত্র নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় শয্যাত্যাগ করতঃ বদনমণ্ডলে বারিসিঞ্চন জন্য উঠিয়া বসিলেন। সুতরাং, তিনি তাঁহার পার্শ্বে অদুনা পদুনা প্রভৃতি রাণীগণকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ময়নামতী এইবার আত্মরূপ প্রকাশ করিলেন—বধূরাণীগণ মৃত স্বামীর জীবন প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন—অপর সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। গোপীচন্দ্রের এখনও মনে হইতেছে, তিনি যেন শয়নকক্ষেই শুইয়া আছেন—সুতরাং তথায় তাঁহার জননীর আগমনে বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমূল সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। এই অপূর্ব্ব ব্যাপারের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গোপীচন্দ্রের বিস্ময়ের অবধি রহিল

না—তিনি তৎক্ষণাৎ জননীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ময়নামতী তখন সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন—'বৎস গোপীচন্দ্র, আর কেন, যাহা বলিলাম তাহা ত সকলই প্রত্যক্ষ করিলে এবং বুঝিলে—তুমি প্রাণ হারাইয়াছিলে, কেবল গুরুপ্রসাদে বহু কষ্টে আজ তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। যমদূতে তোমার প্রাণ হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল—আমি সৌভাগ্যবশতঃ ধ্যানে জানিতে পারিয়া, যমদূতের নিকট হইতে অর্দ্ধপথে তাহা কাড়িয়া লইয়াছিলাম—নচেৎ, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইলে, তোমার প্রাণ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আর কোন আশাই থাকিত না। যমালয়ে প্রাণ লইয়া গেলে, তোমার এমন শরীর নিমেষ মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যাইত। যাহা হউক, এইবার তুমি আমার মন্ত্রের প্রভাব সবই প্রত্যক্ষ করিলে—এখন তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হও, তাহা হইলে তুমি সংসারের সর্ব্ববিধ জঞ্জাল হইতে মুক্তিলাভ করিবে—যম-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চিরকাল অমরত্ব লাভ করিবে'।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

'কেমন কৈরে যেতে চাও পরদেশ লাগিয়া।
কেমন জ্ঞান আছে ময়নায় নেও পরখিয়া'।
'তৈল পরীক্ষা নেও ময়না বরাবর'।

ময়নামতীর তৈল-পরীক্ষা

গোপীচন্দ্র, জননীর অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উপদেশ মত সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য, মনে মনে কতকটা প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার মহিষীগণ, তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া নানারূপ তর্কজালে, তাঁহার মনে পুনরায় ঘোরতর সংশয় জন্মাইয়া দিলেন। তাঁহারা বুঝাইয়া দিলেন—'ময়নামতী ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা-প্রভাবে সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া নানারূপ আশ্চর্য্য ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। প্রকৃত পক্ষে ও-সকল কিছুই নহে। তবে যদি তিনি উত্তপ্ততৈলকটাহে বসিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সাধনার মাহাত্ম্যে কথঞ্চিৎ আস্থা স্থাপন করিতে পারি। আপনি তাঁহার বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া হঠাৎ রাজভোগ পরিত্যাগ করিবেন কেন'?

মহিষীগণের প্ররোচনায় গোপীচন্দ্র এখন সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে, ময়নামতীর বিশেষরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন এবং প্রভাতে রাজ-সভায় উপবেশনপূর্ব্বক খেতুয়া গেলিমকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'তুমি জননীর নিকটে গিয়া বল, তাঁহাকে তৈল-

পরীক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে যদি তিনি উত্তীর্ণা হন, তাহা হইলে আমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারি—নচেৎ নহে। তিনি যদি সহজে তৈল-পরীক্ষা দিবার জন্য আসিতে সম্মত হন, উত্তম; নচেৎ তাঁহাকে যে কোন উপায়ে পার, বন্ধন করিয়া আনয়ন করিবে—আমি তৈল-পরীক্ষার যথোচিত আয়োজন করিবার এই মাত্র আদেশ প্রদান করিলাম।'

গোপীচন্দ্রের আদেশে অনুচরগণ প্রকাণ্ড চুল্লী নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি আশীমণ তৈল সহ বাট মন ওজনের সুবৃহৎ লৌহ-কটাহ স্থাপন করিল। কটাহের মুখ উত্তমরূপে আবৃত করিয়া শালকাষ্ঠের অগ্নি-সংযোগে নির্ধূমভাবে একদিন, দুই দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন পর্য্যন্ত অবিরাম জ্বাল দিয়া সেই তৈল অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করা হইল। রাজ-অনুচরগণ, আদেশানুরূপ তৈল উত্তপ্ত হইবার সংবাদ দিলে, রাজা ময়নামতীকে পরীক্ষা দিবার জন্য আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

ময়নামতী, আপন আলয়ে বংশ-নির্ম্মিত চরকায় সিমূল তুলার সুতা কাটিতেছিলেন। এমন সময় খেতুয়া গোলাম, তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তে তৈল-পরীক্ষা প্রদান করিবার জন্য রাজা গোপীচন্দ্রের আদেশ বিজ্ঞাপিত করিল। ময়নামতী তৈল-পরীক্ষার কথা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাস্যমুখে বলিলেন—'এ সকল ব্যাপার গোপীচন্দ্রের বুদ্ধি-

প্রসূত নহে—হতভাগা বধূগণের দুষ্ট পরামর্শ দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া গোপীচন্দ্র, এইরূপ হাস্যজনক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছে। যাহা হউক, আমি পরীক্ষা দিতে অসম্মত বা কাতর নহি। কিন্তু যখন বধূগণের অসৎ পরামর্শবশতঃ এই আয়োজন হইতেছে, তখন আমি কোন মতেই, এই পরীক্ষা-প্রদানে সম্মত হইতে পারি না। আমি কি তোমার পিতার বা তোমার রাজার অন্নভোগিনী দাসী যে, তোমাদের আদেশমত আমায় পরীক্ষা দিতে হইবে'? ময়নামতীর এই দুর্ব্বচন শুনিয়া খেতুয়া সসম্ভ্রমে নিবেদন করিল—'মা, আপনাকে পরীক্ষা দিতে যাইতেই হইবে—অন্যথা করিলে, রাজ-আদেশ, আপনাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। সুতরাং আপনার বধূগণের উপর অভিমান করিয়া, পরীক্ষা দানে বিরত হইলে চলিবে না। আপনি চলুন, অনর্থক আমাকে অপ্রীতিকর কার্য্য করিতে বাধ্য করিবেন না। রাজার আদেশ অমান্য করিবেন না—শীঘ্র চলুন—পরীক্ষার সকল আয়োজনই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।'

ময়নামতী, খেতুয়ার কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন—'আমি এক পরীক্ষা কেন,সাত পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি—তথাপি গোপীচন্দ্রকে গৃহে বাস করিতে দিব না। বধূগণের মনোভিলাষ বা ভোগবাসনা পূর্ণ হইতে দিব না। চল, আমি স্নানান্তে পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইতেছি।' এই বলিয়া

ময়নামতী প্রথমে ধর্ম্ম এবং তৎপরে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে 'তৈল-খৈল' নিবেদন করিয়া আপন মস্তকে প্রদানপূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং গুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

পরীক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ময়নামতী, গোপীচন্দ্রকে নানারূপ কটূক্তি বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, রাজা গোপীচন্দ্র ময়নামতীর গলায় গামছা দিয়া ও হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে উত্তপ্ততৈলকটাহে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। রাজার আদেশ প্রাপ্ত হইবা মাত্র, অনুচরগণ তৈলকটাহের আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক গামছাদ্বারা ময়নামতীর হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে নিক্ষেপ করিলেন। ময়নামতী উত্তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র, অগ্নি ধূ ধূ প্রজ্বলিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিল। প্রচণ্ড ধূমে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় হইয়া গেল—কেহ কিছু লক্ষ্য করিতে পারিল না। রাজা গোপীচন্দ্র, পাত্র-মিত্র ও অনুচরগণ সকলেই শঙ্কিত ও সংশয়িত চিত্তে দূরে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, সেই বিপুল ধূমরাশি বিলীন হইয়া গেল —পরীক্ষা-ক্ষেত্র যথাপূর্ব্ব নির্ম্মল হইলে রাজা, পাত্র-মিত্র প্রভৃতি এবং সমবেত জনমণ্ডলী সকলেই দেখিতে পাইলেন —ময়নামতী সেই গলিত অগ্নিবৎ উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহ-মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি

করিয়া সেই তৈল মস্তকে সিঞ্চিত করিতেছেন! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া গেল।

তদনন্তর ময়নামতী খেতুয়াকে আহ্বান করিয়া বলিলেন —'দেখ, তোমাদের তৈলে বসিয়া আমার শীত নিবারণ হইতেছে না—তৈলটা আর একটু অধিক গরম করিয়া দিলে ভাল হইত।' ময়নামতীর এই শ্লেষ-ইঙ্গিতে রাজা গোপীচন্দ্র অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং খেতুয়া গোলামকে ভর্ৎসনা করিয়া, নয় দিন নয় রাত্রি ময়নামতীসহ কটাহ-মুখ সাবধানে আবৃত করিয়া প্রবলভাবে জ্বাল দিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

খেতুয়া গোলাম, কটাহ-মুখ অতি সাবধানে আবৃত করিয়া নয় দিন নয় রাত্রি ক্রমাগত প্রবলভাবে জ্বাল দিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা পাত্র-মিত্র সহ উপস্থিত হইয়া, কটাহের আবরণ উন্মোচন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আবরণ উন্মুক্ত হইলে, কেহই ময়নামতীকে দেখিতে পাইল না। ময়নামতী সর্ষপরূপ ধারণ করিয়া উত্তপ্ত তৈলের এক প্রান্তে ভাসিতে লাগিলেন—কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। খেতুয়া গোলাম, ময়নামতীর শোকে কাঁদিয়া আকুল হইল। বহুক্ষণ শোকোচ্ছ্বাসের পর খেতুয়া গোপীচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—'মাতা ময়নামতী ত দেহত্যাগ করিয়াছেন, তবে আর কেন?—শোকের সময় অশৌচাবস্থায় আর রাজবেশ কেন?—আপনি মস্তকের উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলুন।

খেতুয়ার এই মর্ম্মস্পর্শী বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা গোপীচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি জননীর জন্য মা মা শব্দে, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন -'আমায় ধিক্, শত ধিক ; বিধি আমাকে এতদিনে মাতৃহারা করিলেন—আমার কপালে এই ছিল !—এখন আমি অশৌচাবস্থায় অস্পৃশ্য হইলাম ! ব্রাহ্মণ সজ্জন আমার স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন না ! হায় হায় ! মায়ের মত আমায় আর কে স্নেহ করিবে ! মায়ের স্নেহের মধুরতার সহিত কি আর কিছুর তুলনা হয় ! দুগ্ধ, চিনি, নবনী—এ সকল মিষ্ট ও মধুর বটে, কিন্তু মায়ের স্নেহ যে এ সকলের অপেক্ষা কত মিষ্ট, কত মধুর, তাহা কি বাক্যে প্রকাশ করা যায় !'

কিছুক্ষণ পর শোকাবেগ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইলে, গোপীচন্দ্র সেই উত্তপ্ততৈলপূর্ণ লৌহ-কটাহমধ্যে বড় বড় 'কঞ্চি' বা বাঁশের ছড়ি—একবার দুইবার ইতস্ততঃ চালনা করিয়া ময়নামতীর দেহাবশেষের কোনরূপ নিদর্শন আছে কিনা, দেখিলেন ; কিন্তু কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হইলেন না। অবশেষে তৃতীয়বার ছড়ি চালনা করিবার সময়, ময়নামতীকে যে গামছায় বন্ধন করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, কেবল সেই গামছাখানি ছড়ির অগ্রভাগে জড়িত হইয়া উঠিয়া পড়িল—ময়নামতীর দেহের মহামাংসের কোনরূপ চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই !

গোপীচন্দ্র এইবার, ময়নামতীর কোনরূপ দেহাবশেষের চিহ্নমাত্র প্রাপ্ত হইবার জন্য, সমস্ত কটাহের উত্তপ্ত তৈলরাশি নিঃশেষে ঢালিয়া ফেলিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ ষোলজন বলিষ্ঠকায় পরিচারক, সেই আশীমণ তৈল সহ ষাইটমণ ওজনের প্রকাণ্ড লৌহ-কটাহ, 'সাইঙ্গ' বা বংশদণ্ড দ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক ত্রি-পথের সন্ধিস্থলে লইয়া গিয়া তন্মধ্য হইতে সমগ্র তৈল নিঃশেষে ঢালিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে অনলের শিখা যেন বিদ্যুদ্বেগে স্বর্গ স্পর্শ করিবার জন্য ধ্‌ধ্‌ শব্দে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিল! রাজার অনুচর ও পাত্রমিত্র এবং জ্ঞাতিবর্গ সকলেই, এই অনলশিখার অত্যদ্ভুত ঊর্দ্ধ গতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এই অবসরে কটাহে ভাসমানা সর্ষপরূপিণী ময়নামতী সকলের অজ্ঞাতসারে কখন দূর্ব্বাদলের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া গেলেন, কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না। ময়নামতী কিন্তু দূর্ব্বাদলের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়া, জ্ঞাতিবর্গ ও অপর সকলের, তাঁহার প্রতি কাহার কিরূপ মমতা, কাহার কিরূপ ব্যবহার—এ সকল বিশেষরূপেই লক্ষ্য করিলেন। গোপীচন্দ্র নির্ণিমেষনয়নে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

খেতুয়ার ক্রন্দনের বিরাম নাই—কটাহ হইতে সমগ্র তৈল নিঃশেষে উজাড়িয়া ফেলিলে, খেতুয়া ময়নামতীর উদ্ধারের কোনরূপ আশা নাই জানিয়া পাগলের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। খেতুয়ার ক্রন্দনে, ময়নামতীর হৃদয়

দ্রবীভূত হইল—তিনি স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া, তাহাকে পুত্রবধূগণের নিকটে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ বিজ্ঞাপিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। খেতুয়ামুখে বধূরাণীগণ ময়নামতীর মৃত্যুসংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এইবার তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন ভাবিয়া, এই শুভসংবাদ আনয়নের জন্য খেতুয়াকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন।

কিন্তু ময়নারাণীর জীবন প্রাপ্তির কথা, বধূরাণীগণের নিকটে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না—তাহাদের এত আহ্লাদ, এত হর্ষ, ঘোর বিষাদে পরিণত হইল। ময়নামতীর বিদ্রূপপূর্ণ ইঙ্গিতে, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল—তাঁহারা, তাঁহাদের সুখভোগের একমাত্র অন্তরায়, তাঁহাদের স্বামীর জীবন-পথের একমাত্র কণ্টককে, একবারে উন্মূলিত করিবার জন্য দৃঢ়তররূপে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

'অদুনা এ বনে রইনগো পদুনা সোন্দর।
সাত কাইতর বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর॥'
'ভাল পুত্রের বধূ তোরা দয়া আছে মোরে।
পঞ্চতোলা বিষ দিলা বুড়া মারিবারে॥'

ময়নামতীর প্রতি বধূগণের বিষ-প্রয়োগ

অদুনা, পদুনা, রত্নমালা, পদ্মমালা,-প্রমুখ মহিষীবৃন্দ, ময়নামতীর কবল হইতে রাজা গোপীচন্দ্রকে এবং তৎসঙ্গে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার আশু উপায় নির্দ্ধারণ জন্য, অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে সমবেত হইয়াছেন। ময়নামতী, রাজা গোপীচন্দ্রের, সমগ্র রাজ্যের এবং তাহাদের নিজের যে বিষম অনর্থপাত সংঘটন করিবার জন্য, জননী-হৃদয়ের সর্ব্ববিধ দয়ামায়া, স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন দিয়া যেরূপ অনন্যকর্ম্মা হইয়া, এই দারুণ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা নিতান্তই কঠিন। কোন-রূপ যুক্তিতর্ক বা অনুনয়বিনয় ময়নামতীর হৃদয় স্পর্শ করে না—পরন্তু, তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত আপনার অভিপ্রেত সাধনে অগ্রসর হইতেছেন! এই নিমিত্ত, বধূরাণীগণ স্থির করিয়াছেন—ময়নামতীর আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার চরমপন্থা নির্দ্ধারণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

এক রাণী বলিলেন—'এত লোকও মরিতেছে—কিন্তু এই 'সূর্য্যকাণী' বুড়ীর মরণ নাই। বুড়ী একবার মরিলে হয়, সাতদিনের 'বাসি-মড়া' করিয়া,পায়ে দড়ি বান্ধিয়া দূর প্রান্তরে ফেলিয়া দিয়া আসিব—শৃগাল কুকুরে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে। বুড়ী মরুক্—শীঘ্র মরুক্—আমাদের সকলের 'আপদ বালাই' লইয়া এখনই মরুক্।'

অপর এক রাণী বলিলেন—'বুড়ী মাগীর একবার জিদটা দেখ না—কোথা ছেলে-বধূর মঙ্গল চাহিবে, তা-না,—তাঁদের অমঙ্গল ঘটাইবার জন্য নিত্যই কত চেস্টা কত আয়োজন! আমাদের উপর এত আক্রোশ কেন বাপু! তুই আপনার হাড়ি-চণ্ডাল, মন্ত্র-তন্ত্র লইয়া আছিস্, তাই থাক্ না বাপু—অপরের উপর অত্যাচার কেন'?

বধূরাণীগণ যখন নিভৃতে বসিয়া স্বচ্ছন্দমনে, ময়নামতার বিরুদ্ধে এবংবিধ নানারূপ অপকথা প্রয়োগে মনের জ্বালা প্রশমিত করিয়া আনন্দানুভবের চেস্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোথা হইতে ময়নামতী হঠাৎ একবারে তাহাদের সম্মুখেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বধূগণ এমন সময়ে এরূপভাবে ময়নামতীর আগমনে, ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।

ময়নামতী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'ওগো ভাল মানুষের মেয়েরা,তোমরা যা সলা-পরামর্শ করিতেছ,আমি ত সবই শুনিলাম। তা বাছা, আমায় গালই দাও, আর

মন্দই বল—আমি তোমাদের আশার মুখে ছাই দিবই দিব। তোমরা যা' মনে করিতেছ, তা' হইবে না। আমার তোমরা কি করিবে ?—বরং চন্দ্র সূর্য্য একদিন মরিতে বা লয়প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু আমার কোন কালেই মরণ নাই। সুতরাং আমার সঙ্গে বিবাদ করিয়া কি করিবে ?' বধূগণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াই ময়নামতী সেই স্থান হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন—বধূগণের কোন প্রত্যুত্তর শ্রবণ জন্য আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিলেন না।

গুপ্ত ষড়যন্ত্রের বিষয় অন্যের কথা কি, স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত ঘূণাক্ষরে কোন সন্ধান জানিতে পারেন নাই—তবে ময়নামতী এ সংবাদ কোথা হইতে কেমন ভাবে প্রাপ্ত হইয়া ঠিক্ সময়েই উপস্থিত হইলেন—এবং আমাদের গুপ্ত পরামর্শ শ্রবণ করিয়া সগর্ব্ববচনে আমাদের ষড়যন্ত্র-প্রসূত ভাবী অনুষ্ঠানের নিষ্ফলতা বিজ্ঞাপিত করিয়া গেলেন—এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার ! বুড়ীকে কেমন করিয়া আয়ত্ত করা যায়—রাণীগণ সকলেই এই বিষয় লইয়া নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পর, অদুনা রাণী বলিলেন—'বোন্, তোমরা কেহ ব্যস্ত হইও না। ও 'সূর্য্য-কাণী' বুড়ীর পেটে কত বিদ্যা, তা দেখা যাইবে। আমিও যেমন-তেমন মেয়ে নই—আমারও কাছে 'সাত কায়েতের' বুদ্ধি আছে। এত দিন সহিয়াছিলাম ; আর নয়—এইবার টেরটা পাইবে, দেখ না। ও কেমন করিয়া না মরে, তাই আমি এবার দেখিতেছি।'

নানারূপ পরামর্শের পর বিষপ্রয়োগে ময়নামতীর প্রাণনাশ করাই সাব্যস্ত হইল। অদুনা পদুনা প্রভৃতি প্রধানা মহিষী-চতুষ্টয় তখন বাছিয়া বাছিয়া একশত তঙ্কা বা মুদ্রা এবং বস্ত্রাভ্যন্তরে স্বুবর্ণের কৌটা সহ 'মাণিকা'-দোলায় চড়িয়া নিমাই সাধুর বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু-নন্দন, রাজমহিষী-চতুষ্টয় হঠাৎ তাহার কুটীরে পদার্পণ করায় সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের উপবেশন জন্য তাড়াতাড়ি সুবর্ণের খট্টা-সিংহাসন আনিয়া জোড়হস্তে তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।"

মহিষাগণ, সাধু-নন্দনকে গোপনে ধীরে ধীরে কহিলেন—"দেখ, আমরা তোমায় 'পান খাইবার' জন্য বাছা বাছা এই একশত তঙ্কা এবং পরিধানের জন্য 'নেতের কাপড়' দিব—তুমি ময়না বুড়ীকে প্রাণে মারিবার জন্য আমাদিগকে কোন বুদ্ধি বা উপায় বলিয়া দাও।"

মহিষীগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু-নন্দনের বাক্ রুদ্ধ হইয়া গেল—তাঁহার মস্তকে যেন অকস্মাৎ সুমেরু পর্ব্বত খসিয়া পড়িল। ময়নামতী, রাজা গোপীচন্দ্রের গর্ভধারিণী জননী—তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য তাঁহারই বধূগণ উদ্যত—একথা সাধু-নন্দন, মহিষীগণের মুখে স্বকর্ণে শ্রবণ ও তাঁহাদিগকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—সকলই স্বপ্নবৎ অলীক মনে হইতে লাগিল!

কিন্তু চাক্‌চিক্যময় পূর্ণ একশত বাছা বাছা তঙ্কা এবং

নেতের বস্ত্রের প্রভাবে, সাধু-নন্দনের মন হইতে বিস্ময়-মেঘ অচিরেই উড়িয়া গেল!—সে এত বড় ক্রেতার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিল না—নিক্তি-ওজন লইয়া ভাণ্ডার-গৃহে গিয়া পঞ্চতোলা হলাহল মিশ্রণ করিয়া পঞ্চ লাড্ডু প্রস্তুত করিল এবং হলাহল-মিশ্রিত পঞ্চলাড্ডু স্বর্ণ-কৌটা-মধ্যে রক্ষিত করিয়া বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িতভাবে মহিষাগণকে প্রদান করিল। সাধু-নন্দন অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত কহিয়া দিল—'এই প্রচণ্ড-হলাহলমিশ্রিত লাড্ডু ভক্ষণ করিবার একদণ্ড কাল মধ্যেই প্রাণনাশ অনিবার্য্য'।

মহিষাগণ মহানন্দে হলাহলমিশ্রিত লাড্ডু লইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু ময়নামতী অতিশয় চতুরা—কি জানি, কেবল মাত্র লাড্ডু লইয়া গেলে কোনরূপ সন্দেহ করে, এই আশঙ্কা করিয়া বধূগণ, তাঁহাকে অন্যান্য নানারূপ উপহার-সামগ্রীর সহিত সেই হলাহল-মিশ্রিত লাড্ডু প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে বধূগণ বহুবিধ দ্রব্যের আয়োজন করিলেন। সুমিষ্ট নারিকেল, আলো চাউল, কবরী-কলা, নারঙ্গী-কমলা, শালি ধান্যের চিঁড়া, বিন্নি ধানের খৈ, সুমিষ্ট দধি, সুবর্ণের ঝারিপূর্ণ সুনির্ম্মল গঙ্গোদক—ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য, প্রচুর পরিমাণে ভারে ভারে ময়নামতীর নিকটে প্রেরণ করিলেন। এ দিকে, চারি বধূ পদব্রজেই ময়নামতীর আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ময়নামতীর নিকটে, বধূগণের হঠাৎ ভক্তির অকারণ প্রাবল্যের হেতু অজ্ঞাত রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—'বধূগণ আমাকে নিয়তই গালাগালি করে,—আজ হঠাৎ এত সন্দেশাদি দ্রব্য প্রেরণ করিয়া আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য আসিতেছে কেন?' ময়নামতী মনে মনে এই কথার আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বধূচতুষ্টয়, তাঁহার সমীপে হলাহলমিশ্রিত লাড্ডু-পরিপূর্ণ সুবর্ণের কৌটা স্থাপন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণামান্তে বলিলেন—'মা, আপনি আমাদের উপর রাগ করিবেন না, আমরা আপনার শিশুমতি বালিকা। আপনি দয়া করিয়া আমাদের স্বামীকে আমাদিগকে ভিক্ষাস্বরূপ দান করুন—আমরা স্বচ্ছন্দমনে গৃহে প্রত্যাগমন করি। আমরা আপনাকে আর কি দিয়া সন্তুষ্ট করিব?—আপনার সেবার জন্য এই যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্নাদি আনয়ন করিয়াছি—গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন।'

বধূগণের কপট-প্রবন্ধে ময়নামতী মুগ্ধ হইলেন না। তিনি বলিলেন—'বাছা, তোমরা বালিকা; তোমাদের কতটুকুই বা বুদ্ধি আছে?—আমি এই স্থানে বসিয়া তিনকোণে পৃথিবীর কোথায় কি আছে, তাহা গণিয়া বলিতে পারি। আকাশের যত তারা আছে, এক একটি করিয়া সমস্তই গণনা করিতে পারি—ছয় মাস বর্ষার জলরাশি, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া গণিয়া দিতে পারি—সমুদ্রের অতল গহ্বরে কত মৎস্য, কত

কুম্ভীর, তাহাও অনায়াসে গণিয়া বলিয়া দিতে পারি—অন্ধকারে না দেখিয়াও, পুরুষ কি স্ত্রী নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারি। কিন্তু, হা বাছা, তোমরা আমার জন্য যে কি ভেট্ আনিয়াছ, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই? তোমরা ভাল বাপের মেয়ে—শাশুড়ীর প্রতি তোমাদের কত ভক্তি, কত ভালবাসা!—তা না হইলে, আমার সেবার জন্য, পঞ্চ তোলা হলাহলমিশ্রিত পঞ্চ লাড্ডু অত যত্ন করিয়া সুবর্ণ-কৌটায় ভরিয়া আন? তা বাছা, কত খরচ-পত্র করিয়া, কত যত্ন করিয়া আমার জন্য পঞ্চ লাড্ডু আনিয়াছ—আমি সেবা না করিলে তোমাদের মন কত ক্ষুণ্ণ হইবে! তা আমি তোমাদের সাক্ষাতেই ঐ সুবর্ণ-কৌটার হলাহলমিশ্রিত লাড্ডু পাঁচটি ভক্ষণ করিতেছি, দেখ। কিন্তু তোমরা ত জান মা, দেশের এত বুড়া মরিতেছে—আমার কোন কালেই মরণ নাই।'

এই কথা বলিয়া ময়নামতী, গুরু গোরক্ষনাথকে স্মরণ করিয়া বধূগণসমক্ষে, সুবর্ণ-কৌটা হইতে হলাহলমিশ্রিত চাক্‌চিক্যময় লাড্ডু পাঁচটি বাহির করিয়া একে একে সকল-গুলিই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। বধূগণ ময়নামতীর ভবিষ্যদ্দৃষ্টির শক্তি ও প্রসার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন—এখন কিন্তু তাঁহার হলাহলমিশ্রিত পঞ্চলাড্ডু ভক্ষণে তাঁহারা সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন,—ময়নামতী মুখে বাহ্যতঃ যতই বাহাদুরী প্রকাশ করুক না কেন, পঞ্চতোলা

হলাহল উদরস্থ হইয়া রক্তের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে, আর তাহার রক্ষা নাই! ময়নামতী তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিলেও, তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে ভাবিয়া মহানন্দে তাঁহারা অন্তঃপুরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে ময়নামতী, দ্বাদশদণ্ড মধ্যে সেই পঞ্চতোলা হলাহল নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলিলেন—তাঁহার শরীরে সেই পঞ্চতোলা হলাহলের কোন ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হইল না। কিন্তু ময়নামতী ভাবিলেন—তাহা হইলে ত তাঁহার প্রতি বধূগণের ভক্তির বা আদরযত্নের পরীক্ষা হইল না। এইজন্য তিনি দশদিকের দশদ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং মৃত্যুর ভাণ করিয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিলেন। পাছে বধূগণ কপট-মৃত্যু বলিয়া সন্দেহ করে, এইজন্য গায়ের স্থানে স্থানে গুড় লিপ্ত করিয়া দিলেন—অল্পক্ষণ মধ্যেই অগণিত পিপীলিকা আসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। ময়নামতীর মৃত্যুর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আর কোন উপায়ই রহিল না।

অদুনা-পদুনা প্রভৃতি মহিষীগণ, ময়নামতীর নিকট হইতে আসিয়া অবধি আদৌ নিশ্চিন্তা নহেন। তাঁহারা যথেষ্ট সন্দেহের সহিত কালযাপন করিতেছেন। কেন না, তাঁহাদের নিয়তই আশঙ্কা, কি জানি যাদুকরী ময়নামতী কোন মন্ত্র-প্রভাবে এমন প্রচণ্ড পঞ্চতোলা হলাহলকেও জীর্ণ করিয়া ফেলে! এই নিমিত্ত তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়াই

দুষ্টা শাশুড়ী ময়নামতীর সত্যসত্যই মৃত্যু হইল কিনা, সংবাদ লইবার জন্য ঘন ঘন দাসী প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

দাসীগণ ময়নামতীর শয্যাগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মহিষীগণকে সংবাদ দিলেন—'ময়না বুড়ী তাঁহার পর্য্যাঙ্কে মরিয়া পড়িয়া আছেন। আমরা তাঁহার বুকে হাত ও নাসিকার নিকটে তূলা দিয়া দেখিলাম, শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনরূপ চিহ্ন নাই'। রাণীগণ এই শুভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'আঃ, বাঁচা গেল!—বুড়ী মরিল,—দেশের আপদ্-জঞ্জাল দূর হইল'। অদনন্তর বধূ-চতুষ্টয় সকলেই 'লক্ষ্মীবিলাস' সাড়ী পরিধান করিয়া উল্লাসসহকারে হাত ধরাধরি করিয়া ময়নামতীর শয্যাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা যখন বুঝিলেন যে, ময়নাবুড়ী সত্য সত্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা সকলেই ময়নামতীর গণ্ডদেশে দুই তিন 'ঠোকর' মারিলেন। তাঁহাদের আজ আহ্লাদের সীমা নাই! অদুনা সগর্ব্বে বলিলেন—'দেখিলে বোন্, আমার কাছে বুড়ী কতক্ষণ! আমি যে-সে মেয়ে নই—আমার পেটে সাত কায়েতের বুদ্ধি আছে। বুড়ী বড় আস্ফালন করিয়াছিল—এইবার 'উলুয়া' শণের দড়ী গলায় বাঁধিয়া বুড়ীকে খাট হইতে নামাইয়া ফেল।'

অদুনার উপদেশানুসারে পদুনা প্রভৃতি, ময়নামতীর গলায় 'উলুয়া' শণের দড়ী বাঁধিয়া খাট হইতে টানিয়া ফেলিতে

গিয়া দেখিলেন—ময়নামতীকে আদৌ নড়ান যাইতেছে না। ময়নামতী ব্রহ্মজ্ঞান জানে—তিনি শ্বাস নিরুদ্ধ করিয়া পড়িয়া আছেন—কি সাধ্য যে বধূগণ তাঁহাকে নাড়া দিতে পারেন ? তাঁহারা বহুক্ষণ নানারূপ চেষ্টা করিয়াও যখন ময়নামতীকে নড়াইতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা চারিজনে, তাঁহার কটিদেশে চারিবার পদাঘাত করিলেন। তখন ময়নামতী আপনার ব্রহ্মজ্ঞান সংবরণ করিয়া লইলেন—তাঁহার দেহও তখন সোলার ন্যায় লঘু হইয়া গেল। বধূগণ বুঝিলেন, তাঁহাদের পদাঘাতের প্রভাবেই বুড়ার দেহ এইরূপ লঘু হইয়া গেল। এইবার তাঁহারা ময়নামতীর পায়ে দড়ী বাঁধিয়া বন্ধুর পথের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন—কখন বা ধাক্কা দিয়া উচ্চপথ হইতে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন—এইরূপে ময়নামতীর নানারূপ লাঞ্ছনা করিতে করিতে তাঁহারা মেহারকুল সহর অতিক্রম করিয়া গোমতীর কূলে বেলাবসানকালে উপস্থিত হইলেন—শরীরের বেদনায় ময়নামতীর 'হাড় মাস' যেন কর কর করিতে লাগিল।

নদীতীরে আসিয়া অদুনা বলিলেন—'দেখ বোন্, এখানে ফেলিয়া দিলে রাজা নিশ্চয় জানিতে পারিবেন,—চল, এই বুড়াকে পশুশালার ঘরের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখি ; তাহার পর, তাহার উপর ঘোড়া গরু বাঁধা রহিলে, আর কেহ সন্দেহ করিবে না। এই প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করিলেন। পশুশালার হাড়ী-পত্নীকে আহ্বান করাইয়া

তাহাকে নানারূপ পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া বলিলেন—'আমি তোকে ক্ষুরের ধার হীরার কোদালি দিতেছি—তুই শীঘ্র পশুশালায় গিয়া একটি দশগজ গভীর কুণ্ড খনন করাইয়া ফেল্ এবং তাহার চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ বংশের দণ্ড সজ্জিত করিয়া রাখিবি। হাড়ী-পত্নী, রাণীগণের এই আজ্ঞা পাইবামাত্র হাড়ী দ্বারা আজ্ঞানুরূপ এক কুণ্ড খনন করাইল—রাণীগণ তখন ময়নামতীকে সেই কুণ্ডে প্রোথিত করিবার জন্য তৎসমীপে টানিয়া লইয়া গেলেন।

কুণ্ডের সন্নিধানে আসিলে ময়নামতী অপরের অলক্ষ্যে আড়নয়নে কুণ্ডের গভীরতা দেখিয়া ভাবিলেন—'ইহার ভিতর ফেলিয়া একবার মাটি চাপা দিলে আর রক্ষা নাই—তখন আমার রক্ষাজ্ঞান শক্তিশূন্য হইয়া পড়িবে—আমার আর উদ্ধারের কোন উপায় রহিবে না। সুতরাং ময়নামতী ছল করিয়া আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিলেন না—ধীরে ধীরে পদদ্বয় সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া বধূগণ সাতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইলেন—অদুনা তাড়াতাড়ি বলিলেন—'আর বিলম্ব করিও না—ফেল, শীঘ্র ফেল—বুড়ীকে গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া এখনই পুঁতিয়া ফেল'। কিন্তু অদুনার এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই ময়নামতী গাত্র মোটন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বধূগণ তদ্দর্শনে ঊর্দ্ধশ্বাসে কে কোন্‌দিকে পলায়ন করিলেন—ময়নামতীও ধর ধর শব্দে তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবমানা হইলেন।

ময়নামতী বুড়ী হইলেও বধূগণ, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিতে পারিলেন না। ময়নামতী তাঁহাদের নিকটস্থা হইয়া বলিলেন—'তোমরা আমার বেশ পুত্রবধূ হইয়াছ! বুড়া শাশুড়ী বলিয়া তোমাদের শরীরে একটুকুও দয়া নাই—গালে তিন ঠোকর মারিলে—কোমরে চারিলাথি মারিলে—আবার রাস্তায় রাস্তায় টানিয়া টানিয়া আস্তাবলে পুঁতিবার জন্য লইয়া আসিয়াছ'!

বধূগণ বলিলেন—'না-না; কে আপনাকে বলিল যে, আপনাকে আমরা পুঁতিবার জন্য এখানে আনিয়াছি?—আপনার সর্ব্বাঙ্গে গুড় লাগিয়াছিল, তাই আস্তাবলে আপনাকে স্নান করাইবার ও ধৌত করিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিলাম। আপনি গলায় উলুয়াশণের দড়া লইয়া সাগরদীঘির জলে স্নান করিয়া আসুন—আমরা আবার আপনাকে আপনার মন্দিরে লইয়া যাইব'। এই বলিয়া—বধূগণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ময়নামতীর নিকট হইতে বিষণ্ণবদনে প্রস্থান করিলেন। ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাঁহাদের দুঃখের অবধি রহিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

'রাজাএ বলে শোন মাও ময়নামতী আই।
সাচা মিছা তোমার জ্ঞান পরীক্ষিতে চাই।'
'ছয় মাসের পথ হয় শ্রবণ নয়ান।
তবে ত প্রবোধ যদি দেখি বিদ্যমান॥'

ময়নামতীর অগ্নি-পরীক্ষা

বধূগণের অসদ্ব্যবহারে ময়নামতী অত্যন্ত কুপিতা হইয়া একবারে রাজা গোপীচন্দ্রের শয়ন-মন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা দ্বারবন্ধ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন—ময়নামতী ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যা হইয়া দ্বারদেশে সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ এইরূপ শব্দে চমকিত হইয়া রাজা শয্যাত্যাগ করিয়াই দেখিতে পাইলেন—জননী ময়নামতী ক্রোধে উগ্রমূর্ত্তি হইয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন!

গোপীচন্দ্রকে দেখিবামাত্র ময়নামতী বলিলেন—'তুমি ত বেশ নিশ্চিন্তমনে দিবাভাগেই, মধ্যরাত্রির ন্যায় ঘোর নিদ্রায় অচেতন রহিয়াছ—এদিকে তোমার গুণবতী পত্নী চারিজন আমার যে কি দুর্গতি করিল, তাহার কোন সংবাদই লইতেছ না! তুমি ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বকথা জানিলে না, বা জানিবার জন্য চেষ্টা বা আগ্রহ প্রকাশও করিলে না—আমার নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান ছিল বলিয়া আজ তোমার বধূগণের হস্ত

হইতে রক্ষা পাইয়াছি। তাহারা কত ছল করিয়া পঙ্কতোলা বিষ ভক্ষণ করাইয়াছিল—বিদ্যার প্রভাবে আমি তাহা জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি—কিন্তু তোমার বধূগণের কি দুর্ব্বুদ্ধি, কি দুষ্ট ব্যবহার' !

মহিষীগণ, তাঁহার জননীকে বিষপ্রয়োগ করিবে, এ কথা গোপীচন্দ্রের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি বলিলেন—'মা, আপনি বধূগণের সহিত এরূপ বিবাদ করিতেছেন কেন, আপনার শরীরে কি দয়া, মায়া বা ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই!' ময়নামতী বলিলেন—'বাবা, আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলি নাই—যদি আমি মিথ্যা বলিতেছি, তবে আমি অধিক আর কি বলিব, তুমি আমার একমাত্র পুত্র—আমি তোমা-হারা হইব।' কঠোর শপথ শ্রবণ করিয়া ময়নামতীর প্রতি বধূগণের অপব্যবহারের কথা, গোপীচন্দ্র আর মিথ্যা মনে করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তদ্দণ্ডেই বধূগণকে বধ করিবার জন্য স্বর্ণমুষ্টি তরবারি গ্রহণ করিয়া বধূগণের উদ্দেশে ছুটিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। ময়নামতী অগ্রসর হইয়া রাজাকে ক্ষান্ত করিলেন এবং বলিলেন—'বধূগণ অল্পবুদ্ধি বালিকা—তাহাদের বাক্যে ও কার্য্যে ক্রোধ করা বৃথা। তাহারা যাহা করিয়াছে, আমার দেহে তাহা সহ্য হইল, সেই ভাল কথা ; তাহাদিগকে কোনরূপ দণ্ড দিতে আমি ইচ্ছা করি না।'

রাজা গোপীচন্দ্র জননীর মহত্ত্ব ও উদারতা দর্শনে মোহিত

হইয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বলিলেন—'আমি আপনার আদেশে যোগী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিব : তবে, আমায় কিছু সময় দি'ন, আমি বধূগণকে বুঝাইয়া তাহাদের মত সংগ্রহ করি। নচেৎ, তাহারা আমায় বড়ই বিরক্ত ও বিব্রত করিয়া তুলিবে।' ময়নামতী, স্বকার্য্য উদ্ধারের সময় আগতপ্রায় বুঝিয়া আনন্দিতমনে আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় শেষ কথা বলিয়া গেলেন—'তুমি সত্বর বধূগণকে বুঝাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য প্রস্তুত হও। বিলম্ব করিলে এবার তোমায় ক্ষমা করিব না—সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত করিয়া দিব।'

রাজা গোপীচন্দ্র মহিষীগণকে বুঝাইতে আসিয়া নিজেই 'অবুঝ' হইয়া গেলেন। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদের সহবাসে মহানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রাণীগণের অনুনয় বিনয়, উপরোধ অনুরোধ, কাতর ক্রন্দন—সর্ব্বোপরি, তাঁহাদের রূপজ মোহ ও তজ্জনিত মায়াবশতঃ, তিনি যথাপূর্ব্ব রমণীগণের সহিত বিলাস-ক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিলেন।

এইরূপে রাণীগণের সহিত 'ত্রি-রাত্রি' অতিবাহিত করিলে পর, ময়নামতীর সহিত গোপীচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। গোপীচন্দ্র ইতঃমধ্যে মহিষীগণের নিকট হইতে বহু পরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া শক্তি-সঞ্চয় করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ময়নামতীর সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র বলিলেন,—'আপনি

যদি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া থাকেন, এবং সতীলক্ষ্মী বটেন, তবে কেন আমার পিতার মৃত্যুকালে আপনি সহমরণে 'সতী' হন নাই। ময়নামতী এই কথা শুনিয়া বলিলেন—'সে কি কথা! আমি ত সতী হইবার জন্য তোমার পিতার চিতায় জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে সাতদিন নয় রাত্রি বসিয়াছিলাম - কিন্তু আমার কি মৃত্যু আছে? অনলে আমার কি করিবে—আমার মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞান রহিয়াছে!'

গোপীচন্দ্র বলিলেন—'আমি শুদ্ধ আপনার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না—আপনি যে 'সতী' হইবার জন্য চিতানলের মধ্যে সাত দিন নয় রাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ চাই।' ময়নামতী বলিলেন—'সে অনেক দিনের কথা, তখন তুমি আমার গর্ভে। এত দীর্ঘকাল পরে সাক্ষ্য সংগ্রহ করা কঠিন।' তদনন্তর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিয়া ময়নামতী হাস্যমুখে বলিতে লাগিলেন—'মনে হইয়াছে, সে দিনের ঘটনার তিন জন সাক্ষীর নাম মনে হইয়াছে। প্রথম দামোদর ভাট, দ্বিতীয় সন্দিহর ব্রাহ্মণ এবং তৃতীয় লক্ষ্মীধর সাধু। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, সাক্ষীদিগকে আনিবার জন্য এখনই অনুচর প্রেরণ কর।'

সন্দিহর ব্রাহ্মণ-সমীপে রাজদূত আসিয়া প্রণামান্তে জানাইল—'যে দিন মহারাজ মাণিকচন্দ্রের শব সংকৃত হয়, সে দিন আপনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজার আজ্ঞা, আপনি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্য

প্রদান করিবেন। সন্দিহর ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তান্বিত ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তদনন্তর বলিলেন—'মহারাজ মাণিকচন্দ্র আজ আঠার বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। কাল কি খাইযাছি, আজ তাহা মনে থাকে না—তবে, এতদিনের কথা কেমন করিয়া মনে থাকিবে? কিন্তু একটা কথা বেশ মনে আছে—মহারাজ মাণিকচন্দ্রের জ্ঞাতি গোত্র একত্র হইয়া সাতদিন ক্রমাগত দাহন করিয়াছিলেন—রাণী ময়নামতী রাজার জ্বলন্ত চিতায় এই সাত দিন নয় রাত্রি বসিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার শরীরে অনলের সামান্যমাত্রও তাপ লাগে নাই!'

এই কথা শুনিয়া দূত, ব্রাহ্মণ সন্দিহরকে গোপনীয় স্থানে আহ্বান করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—'রাজা ও রাণীগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনি এ বিষয়ে তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা করেন। তাহা হইলে, আপনাকে রাণীগণ, হীরা-মণি-মাণিক্য, রজত, কাঞ্চন যাহা চাহিবেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ দিতে প্রস্তুত আছেন। আপনার ভাণ্ডার ধনরত্নে পূর্ণ করিয়া দিবেন—দুগ্ধ সেবন জন্য একশত দুগ্ধবতী গাভী এবং অন্ন সেবার জন্য সুবর্ণের থালা প্রদান করিবেন।'

দূতের নিকটে এবংবিধ বাক্য শুনিয়া, সন্দিহর ব্রাহ্মণ ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন—'তুমি দূত, তায় তুমি বয়োবৃদ্ধ হইয়াছ—তোমায় আর কি বলিব? তুমি আমার সমক্ষে আর এ কথা উচ্চারণ করিও না। ধনের

লোভে আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া কি আমার ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই বিনষ্ট করিব ? তুমি আমার বাটী হইতে দূর হও।

দূত, নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যে শান্ত করিয়া, ব্রাহ্মণকে রাজার সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা সন্দিহরকে দেখিবামাত্র ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক ধীরে ধীরে ইঙ্গিত সহকারে বলিলেন—'আপনি ব্রাহ্মণ, আমি যাহাতে সিংহাসনে বসিয়া রাজ-ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিবেন'। এদিকে ময়নামতী ব্রাহ্মণের নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণ, আপনি অতিশয় ধার্ম্মিক ব্যক্তি, আপনার ঊর্দ্ধে দেবতা রহিয়াছেন, আপনি যাহা যথার্থ জানেন, এই রাজসভামধ্যে সমস্ত আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিয়া বলুন'।

সন্দিহর তখন রাজসভায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশ্যভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"দেখুন, আমি ব্রাহ্মণ, দেহে প্রাণ থাকিতে আদৌ মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। আমি আদি অন্ত যাহা জানি প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ করুন—'যেদিন মহারাজ মাণিকচন্দ্র পরলোক গমন করেন, সেদিন তাঁহার সমস্ত জ্ঞাতি-গোষ্ঠী একত্র হইয়া মহারাজের চিতা সজ্জিত করিল। ময়নামতী সেই চিতায় রাজার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর তাহারা সকলেই সেই চিতায় ঘৃতাদি নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিসংযোগ করিলেন। চিতা সাত দিন নয় রাত্রি, অবিরত ধূ-ধূ জ্বলিতে লাগিল। জ্ঞাতিগণ নাড়িয়া চাড়িয়া অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া রাজার শব ভস্মীভূত

করিল। কিন্তু রাজা তিলকচান্দের কন্যা, রাণী ময়নামতীর অঙ্গে চিতাগ্নির সামান্য শিখা পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই—রাণী অক্ষতদেহে অবিকৃতভাবে রাজার ভস্মাবশেষ ক্রোড়ে লইয়া জ্বলন্ত চিতায় বসিয়াছিলেন! আমি সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম—এবং স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি একবর্ণও মিথ্যা বা অতিরিক্ত বলিলাম না। কলির ব্রাহ্মণের মিথ্যা কথা কহা অভ্যাস—সেই জন্য তাঁহাদের কখন ধন সম্পদ্ হয় না—তাঁহারা চির দরিদ্র।"

রাজা গোপীচন্দ্র, তাঁহার অনভিমত ব্রাহ্মণের প্রতিকূল ও স্পষ্টবাক্যে অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং দূতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'এই অপদার্থ ব্রাহ্মণকে আমার সভা হইতে অপমানিত করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দাও'। দূত ইতঃপূর্ব্বে ব্রাহ্মণের নিকট ভর্ৎসিত ও অপমানিত হইয়া, তাহার উপর রাগান্বিত হইয়াছিল—সুতরাং এখন, তাহার মনের মত রাজ-আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র, ধাক্কা দিয়া ব্রাহ্মণকে রাজসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ অকারণ অপমানিত হইয়া রাজাকে নির্ব্বংশ হইবার অভিশাপ করিতে করিতে, সাতিশয় ক্ষুণ্ণমনে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাজা গোপীচন্দ্র ময়নামতীর চরণে প্রণামান্তে বলিলেন—'আমি এখন বেশ বুঝিলাম, আপনি কখনও অযথা বাক্য বলেন না। আপনার উপদেশমত আমি যোগী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ এবং খেতুয়ার নিকটে রাজপুরীর ভার অর্পণ করিব।

কিন্তু আমার পত্নীগণকে কাহার নিকটে রাখিয়া যাইব—ইহাই এখন আমার একমাত্র চিন্তা। তবে আমার বড় ভাই ডুধাই সোন্দর আছেন—দেখি,তাঁহার নিকটে রাখিয়া গেলেও চলিতে পারে। কিন্তু, আমার মনের এখন দ্বিধা রহিয়াছে—আপনি যে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাববশতঃ অনলে দগ্ধ হন না, এ কথা অপরের নিকটে শুনিলেও, আমার মনের সন্দেহের নিরসন হইতেছেনা। আপনি এ বিষয়ে আমাদিগকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি। তখন রাজ্য বা অদুনা পদুনার মায়া পরিত্যাগ করিয়া হাড়িফার চরণ সেবা করিবার জন্য দেশান্তরিত হইব'।

ময়নামর্তী গোপীচন্দ্রের বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'এ অতি উত্তম কথা। আমি এখনই প্রস্তুত আছি—তুমি এ বিষয়ের আয়োজন কর—গুরু গোরক্ষনাথের বরে অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতে পারিবে না'। রাজা সঙ্গে সঙ্গে দূতকে আহ্বান করিয়া সহস্র মুদ্রার জৌ বা লাক্ষা আনয়ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। যথাসময়ে জৌ আনীত হইলে, অভিজ্ঞ শিল্পী ডাকিয়া অবিলম্বে জতু-গৃহ নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন। শিল্পী, নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিচিত্র জতু-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিল এবং জতু-গৃহমধ্যে দশগজ গভীর কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অগুরু চন্দন সুসজ্জিত করিয়া রাখিল।

ময়নামর্তী স্নানান্তে দিব্য সুবর্ণের সাড়ী পরিধান করিয়া

জতু-গৃহাভ্যন্তরস্থ সুসজ্জিত কুণ্ড মধ্যে উপবেশন করিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা গোপীচন্দ্রের মনে অত্যন্ত অশান্তি ও অনুশোচনা উপস্থিত হইল। তিনি ময়নামতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'না মা, আপনার এ পরীক্ষায় কাজ নাই —আপনি দগ্ধ হইয়া গেলে, জগন্ময় আমার ঘোর অপযশ ঘোষিত হইবে—আমি চিরকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিব'।

ময়নামতী বলিলেন—'বৎস, তুমি চিন্তা করিও না; অনলে আমার মৃত্যু নাই। তুমি কোনরূপ দ্বিধা করিও না —কুণ্ডে ও সমগ্র জতু-গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া দাও— আর অনর্থক কালবিলম্ব করিও না'। রাজা গোপীচন্দ্র কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং শিখা সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ভীষণ অগ্নি-ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিল।

রাজা পাত্র-মিত্র সহ, সমগ্র জতু-গৃহব্যাপী প্রকাণ্ড অগ্নি-ক্ষেত্রের প্রতি স্তম্ভিতভাবে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। অদুনা পদুনা প্রভৃতি ছয় কুড়ী রাণী কপট-প্রবন্ধে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—কিন্তু তাঁহাদের কাহারও নেত্র আর্দ্র হইল না! রাজা গোপীচন্দ্র কিন্তু অবশেষে হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত পাত্রমিত্রগণও ময়নামতী পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল ভাবিয়া, চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ক্রমাগত দ্বাদশ দণ্ড কাল অগ্নি প্রবলবেগে প্রজ্বলিত রহিয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তখন রাজা তাড়াতাড়ি কুণ্ড হইতে ভস্মরাশি উত্তোলন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অনুচরবৃন্দ ভস্মরাশি উত্তোলন করিলে সকলেই দেখিতে পাইল—ময়নামতী যথাপূর্ব্ব অক্ষতদেহে ধ্যানস্থা হইয়া বসিয়া আছেন!—দেহে অগ্নির শিখা পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই—পরিধান-বস্ত্রে ধূমের চিহ্নপর্য্যন্ত লক্ষিত হইল না—পরন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন জল চুয়াইয়া পড়িতেছে! রাজা, পাত্রমিত্র প্রভৃতি সকলেই নিতান্ত অপ্রতিভ ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন!

ময়নামতী যোগ-সংবরণ করিয়া গোপীচন্দ্রকে বলিলেন—'এই ত, তুমি যাহা শুনিয়াছিলে, তাহা এখন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে—এইবার চল, আমরা মাতাপুত্রে যোগী হই'। রাজা বলিলেন—'আমার কিন্তু মনে হইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান বশতঃ অগ্নিতে আপনার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে। সেইজন্য আপনি অগ্নি-পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হইলেন। এখন আপনি যদি জল-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি'।

ময়নামতী কিছুতেই পশ্চাৎপদ বা পরাঙ্মুখ নহেন—তিনি গোপীচন্দ্রকে জল-পরীক্ষার আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

'যত অপরাধ মাও ক্ষেমহ আমার।
যত কথা সব সত্য জানিনু তোমার॥'

ময়নামতীর বিবিধ পরীক্ষা

রাজা গোপীচন্দ্র, পারিষদবর্গ-সমভিব্যাহারে, সমুদ্র-সৈকতে ময়নামতীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে ময়নামতী রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরীক্ষার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত দেখিয়া ময়নামতী, করযোড়ে গঙ্গাদেবীর কৃপাভিক্ষা করিলেন।

রাজার ইঙ্গিতমত অনুচরবর্গ, রাণী ময়নামতীকে 'ছালা' বা বস্তার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া গভীর সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া দিল। ময়নামতীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবামাত্র গঙ্গাদেবী স্বয়ং অগ্রসর হইয়া যুগল হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে, মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায়, ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং কত আদর যত্ন করিয়া সুবর্ণের বাটা ভরিয়া তাম্বূল প্রদান করিলেন। ময়নামতী গঙ্গাদেবীর আশ্রয় লাভ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাকে বলিলেন—'মা, এইবার আমি আপনার আলয়ে ফিরিয়া যাই—গোপীচন্দ্র আমাকে সমুদ্রের মধ্যে অতল গর্ভে চিরতরে নিমগ্ন করিয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকুক'। ময়নামতীর প্রার্থনায় গঙ্গাদেবী বস্তায় আবদ্ধ ময়নামতীকে লঘুদ্রব্যের মত সমুদ্র তরঙ্গে ভাসাইয়া দিলেন।

এদিকে গোপীচন্দ্র জননীকে অতল সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন করাইয়া মনে মনে অনুতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'ছিঃ, আমি কি অপকর্ম্মই না করিলাম—আমার এ অপযশ ত্রিভুবনে সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হইবে—আমার মত মাতৃদ্রোহীর লজ্জা রাখিবার স্থান নাই!' এমন সময়ে দূরে সমুদ্রতরঙ্গে ময়নামতীকে ভাসমানা দেখিয়া, তাঁহাকে তীরে আনয়ন করিবার জন্য নৌকা প্রেরণ করিলেন। ময়নামতীকে কূলে আনয়ন করিলে, গোপীচন্দ্র তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া ময়নামতীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং বস্তার বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিলেন। ময়নামতী সহাস্যবদনে বাহির হইয়া আসিলেন।

গোপীচন্দ্র বলিলেন—'মা, বুঝিলাম, আপনার নিকটে মৎস্যের জ্ঞান আছে—তজ্জন্যই আপনি এইভাবে সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন হইয়াও ভাসিয়া বেড়াইতে পারেন। আপনাকে আর এক পরীক্ষা দিতে হইবে—ক্ষুরের ধারের মত সূক্ষ্ম কেশ-নির্ম্মিত সেতুর উপরে যদি আপনি পদব্রজে গমন করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিব আপনার নিকটে সত্য সত্যই ব্রহ্মজ্ঞান আছে।' ময়নামতী বলিলেন—'এ আর বেশী কথা কি, এখনই প্রস্তুত আছি—গুরুর নাম স্মরণ করিয়া এখনই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাইব।' ক্ষুরধার কেশের সেতু প্রস্তুত হইলে, ময়নামতী তাহা বিনাসাহায্যে অনায়াসে পদব্রজে উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন।

রাজা গোপীচন্দ্র এইবার জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—'আপনি এ সকল পরীক্ষা মন্ত্রশক্তির প্রভাবে উত্তীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু তুলা-পরীক্ষা গ্রহণ না করিলে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। আপনি তুলা-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হউন'। ময়নামতী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—'আমি যে কোনরূপ পরীক্ষা প্রদান জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি—তোমার যাহাতে তৃপ্তিলাভ হয়, তদ্রূপ ব্যবস্থা কর'।

রাজার আদেশানুসারে, সভাগৃহের সুপ্রশস্ত কক্ষমধ্যে সুবৃহৎ তুলাদণ্ড সংস্থাপিত হইল। সেই তুলাদণ্ডের এক পার্শ্বে ময়নামতীকে উপবিষ্ট করাইয়া অপর পার্শ্বে একটি পোস্ত-দানা স্থাপন করা হইল। ময়নামতী অপেক্ষা পোস্ত-দানা অধিকতর ভারযুক্ত হইল—তুলাদণ্ডে ময়নামতীর আসন ঊর্দ্ধে উঠিয়া রহিল। রাজা অপ্রস্তুত হইলেন ভাবিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন—'ও তুলাদণ্ড ঠিক্ নহে—উহার তুলাকোটী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তুলামান ঠিক্ হইল না। ময়নামতীর আসন তজ্জন্যই ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল'।

রাজাজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ এক সুবর্ণময় তুলাদণ্ড রাজসভায় আনীত হইল। তাহার এক পার্শ্বে ময়নামতী এবং অপর পার্শ্বে একটি তুলসী-পত্র স্থাপিত হইল। কিন্তু এবারও তুলসী-পত্রসংযুক্ত আধার নিম্নে পড়িয়া রহিল—ময়নামতীর আসন স্বর্গ-উদ্দেশে ঊর্দ্ধে দোদুল্যমান রহিল।

লোকে ময়নামতীর অলৌকিক শক্তি দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

গোপীচন্দ্রের মন কিন্তু এখনও শুদ্ধ বা পরিতৃপ্ত হইল না—তিনি নৌকা-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার আদেশমত, তুষের এক নৌকা প্রস্তুত হইল—'কাকুয়া' ধান্যের 'সুঙ্গ' তাহার 'বৈঠা' হইল—ময়নামতীকে এই নৌকার সাহায্যে সর্ব্বজন সমক্ষে একক সুদুস্তর বৈতরণী নদী উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এই বৈতরণী নদীর প্রসার এত দীর্ঘ যে, এক বার যাতায়াত করিতে পূর্ণ এক বৎসরকাল সময় অতিবাহিত হয়। নদীর তরঙ্গ এক একটি পর্ব্বতের চূড়া—এক একটি উত্তালতরঙ্গ যেন একবারে স্বর্গ স্পর্শ করে! ময়নামতী এই তুষের নৌকার সাহায্যে এই সুদুস্তর বৈতরণী নদী পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই নৌকার যথাবিধি পূজা না করিয়া, এই উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সুদুস্তর নদীতে তিনি অবতরণ করিবেন না।

কিন্তু নৌকার পূজা করিবে কে? ময়নামতী প্রথমে গোরক্ষনাথকে স্মরণ করিলেন। ক্রমে হাড়িসিদ্ধা, বীরনাথ, মীননাথ এবং সর্ব্বশেষে ভোলা মহেশ্বরকে এই পূজা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সকলেই পরাঙ্মুখ হইলেন—কেহই সাহস করিয়া এই তুষের নৌকার পূজা করিতে অগ্রসর হইলেন না। তখন ময়নামতী এক প্রচণ্ড হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দেবতাগণ যে যেখানে যেরূপ

অবস্থায় . ছিলেন, প্রাণভয়ে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ভোলা মহেশ্বর কচুবাড়ী দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন—তিনি কোলা-বেঙ্গের মত লম্ফ দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার আর গত্যন্তর রহিল না—তাঁহাকে নৌকা-পূজার পৌরোহিত্য করিতেই হইল।

ভোলা মহেশ্বর নানারূপ 'উল্টা'-মন্ত্রে, নৌকা-পূজা সমাধা করিলেন। ময়নামতী গুরুমন্ত্র জপ করিয়া সেই তুষের নৌকায় উঠিয়া বংশীধ্বনি করিলেন—নদীর জল তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়া উজান বহিতে লাগিল। ময়নামতী তখন তুষের নৌকাখানি, আপন কবরীমধ্যে গুজিয়া রাখিলেন এবং সোনার খড়ম পরিয়া পদব্রজেই সেই তরঙ্গ-সঙ্কুল সুদুস্তর নদী, নিমেষমধ্যে অতিক্রম করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইবার রাজা গোপীচন্দ্র, জননীর চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—'মা, এখন আমার মনের সকল সন্দেহের নিরসন হইল। আমি আপনার জ্ঞান ও শক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়া যেরূপ ধৃষ্টতা বা চপলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছি—আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি তৎসমুদয় আমায় ক্ষমা করুন। আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল—আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সকলই সত্য। আপনার ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ-বিষয়ে আমার আর কণামাত্রও সন্দেহ নাই। আমি এখন বুঝিতে পারিলাম, আপনি প্রকৃতই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছেন। আমি

আপনার সকল আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিপালন করিব। এখন আপনি আমায় আদেশ করুন—আমি তৎপ্রতিপালনে যত্নপর হই।'

ময়নামতী বলিলেন—'বৎস, তোমার প্রতি আমার আর দ্বিতীয় আদেশ নাই। তুমি অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া উনবিংশ বর্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছ—এই সময়ে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশান্তরিত না হইলে, তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য। সেইজন্য তোমায় আমি পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশত্যাগ করিবার জন্য কহিয়া আসিতেছি। কিন্তু তুমি কামিনী-কাঞ্চনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আমার সতুপদেশের প্রতি কর্ণপাত করিতেছ না। এখন তুমি আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহশূন্য হইতে পারিয়াছ। এখন আমার বাক্যে যদি তোমার কিছুমাত্রও আস্থা জন্মিয়া থাকে, আমি এখনও বলিতেছি—আমার একমাত্র আদেশ—তুমি এই মিথ্যা সংসারের মায়া-মোহ পরিত্যাগ করিয়া অচিরে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দেশান্তরে গমন কর'।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

'হাড়ি নহে হাড়িফা জ্ঞান পবিতর ।
লেখায় ভাঙ্গর হাড়ি ষোলশত নফর ।'
'মহাদেবীর শাপে তোমার ঘরে খাটে ।
মহাজ্ঞান আছে জান হাড়িফার পেটে ॥'

হাড়িফার পরীক্ষা—সঙ্কল্প

গোপীচন্দ্র গভীর চিন্তার পর উপলব্ধি করিলেন, তাঁহার জননীর আশঙ্কা মিথ্যা হইবার নহে এবং তাঁহার উপদেশমত সন্ন্যাস গ্রহণই, আসন্ন মৃত্যু-দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র প্রশস্ত উপায়।

এই নিমিত্ত সন্ন্যাস-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, তিনি পর দিন প্রাতে ময়নামতীর নিকটে আগমন করিয়া চরণ-বন্দনা পূর্ব্বক বলিলেন—'মা, আপনি যোগী হইবার জন্য আমায় নিয়তই কত অনুরোধ করিয়াছেন—আমি কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ তাহা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি ; তদ্ব্যতীত, আপনাব জ্ঞানলাভের বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, আপনার প্রতি কত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি এবং অপরের অপব্যবহারে, ইচ্ছাপূর্ব্বক সহায়তা করিয়াছি। আমি এখন অনুতপ্ত হইয়া আপনার আদেশানুসারে যোগী হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি—এখন আমি কোন্ যোগীর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিব এবং কাহার সহিত বা

দেশান্তরে চলিয়া যাইব, আপনি তাহা আমায় নির্দ্দেশ করিয়া দি'ন।'

ময়নামতী বলিলেন—'আমি ত প্রথম অবধি তোমায় বলিয়া আসিতেছি—আমি গুরুগোরক্ষনাথের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি—তুমি হাড়ি-সিদ্ধার নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করিবে। তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞানেই তোমার মুক্তিলাভ হইবে।' জননীর মুখে, যথাপূর্ব্ব সেই হাড়িফার নিকটে দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব শুনিয়া গোপীচন্দ্র সাতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'আমি বরং বিষপানে আত্মহত্যা করিব, তথাপি সেই জঘন্য নিত্য-অশুচি হাড়িফার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারিব না। হাড়ির নিকটে যদি জ্ঞানই রহিবে, তবে সে পেটের দায়ে হাড়ি-কর্ম্ম করে কেন? আমি 'বাইশ-দণ্ডের' রাজা—আমি কোন্ দুঃখে আমার পশুশালার হাড়িকে গুরু স্বীকার করিয়া তাহার চরণে প্রণাম করিব?'

এই কথা শুনিয়া ময়নামতী বলিলেন—'আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাড়িফা সামান্য লোক নহেন—উনি মহাসিদ্ধা যোগী পুরুষ—ক্ষণেকের চাঞ্চল্যবশতঃ মহাদেবীর অভিশাপে তোমার পশুশালায় হাড়িকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন মাত্র—অভিশাপান্তে তিনি আবার পূর্ব্বের ন্যায় সিদ্ধা হইবেন। হাড়ি-সিদ্ধার নিকটে পবিত্র, মহাজ্ঞান রহিয়াছে—উঁহার অধীন ষোলশত পরিচারক বা চেলা আছে। হাড়িফা ইচ্ছা করিলে শুদ্ধ তাঁহার মস্তকের কেশদিয়া একখান'সাতপাঁটী' ঘর সমগ্র

ছাদন করিতে পারেন। এমন সিদ্ধপুরুষকেও তুমি কোন্ সাহসে হেয় জ্ঞান কর? তুমি ধীরে কথা কও—হাড়িফা যদি তোমার কথা শুনিতে পান, তবে তিনি তোমায় অভিসম্পাত করিবেন। হাড়িফার অসাধারণ ক্ষমতার সহিত কাহারও তুলনা হয়? তুমি নগরে তৈলের প্রদীপ প্রজ্বালিত কর, হাড়িফা শুদ্ধ গঙ্গা-জল দিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া থাকেন। তিনি কোথায় আহার করেন,কোথায় অবস্থান করেন, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা হইলে, সঙ্গে সঙ্গে নদীতে সেতু প্রস্তুত হয়—তুমি তাঁহাকে কখনও সামান্য জ্ঞান করিও না।'

গোপীচন্দ্রেব মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলেও এখন পর্য্যন্ত তিনি তর্ক বা পরীক্ষা-নির্ব্বিশেষে বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং, কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে হাড়িফার তথা-কথিত অলৌকিক শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ময়নামতীকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—'হাড়িফার নিকটে কিরূপ জ্ঞান আছে, তাহার আমি স্বয়ং, পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া কিছুতেই তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিতে পারি না।'

গোপীচন্দ্রের এইরূপ সংশয়সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া ময়নামতী বলিলেন—'সে ভাল কথা। আজ তুমি আমার বাটীতে চল—সেখানে আমরা মাতাপুত্রে 'লালটঙ্গীতে

রাত্রিবাস করিয়া প্রাতঃকাল হইবামাত্র, তোমায় হাড়িফার অলৌকিক শক্তির প্রমাণ প্রদর্শন করিব। গোপীচন্দ্র মাতার অভিপ্রায়মত, তাঁহার 'লালটঙ্গী'তে রাত্রি যাপন করিলেন। নিশাবসানে পূর্ব্বদিক্ অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া ক্রমেই সূর্য্যদেবের কিরণমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখন ময়নামতীর অঙ্গুলিসঙ্কেতে গোপীচন্দ্র নেত্রপাত করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন—

হাড়িফা স্কন্ধে কোদালি লইয়া চলিয়া যাইতেছেন - অগ্রে একজন এবং পশ্চাতে দুইজন অনুচর তাঁহার সহিত গমন করিতেছে। যমরাজের পুত্র মেঘনাল, হাড়িফার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে। এইরূপে পথ অতিক্রম করিয়া হাড়িফা আপন আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বসুমতী তাঁহাকে বসিবার জন্য খট্টা আনিয়া দিলেন। হাড়িফা সেই খট্টায় যোগাসনে বসিয়া হুঙ্কার দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে ঊনশত অনুচর কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার আদেশমত তাঁহার বাটীর প্রাঙ্গণস্থ তৃণাদি পরিষ্কৃত করিয়া সুবর্ণের মার্জ্জনীদ্বারা চত্বর মার্জ্জনা করিল। তৎপরে তাহারা সুবর্ণ কৌটায় রক্ষিত ঘর্ষিত চন্দনের প্রক্ষেপ চতুর্দ্দিকে প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল!

গোপীচন্দ্রের সম্মুখে যে সব ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তাহা স্বপ্নবৎ আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইল—অথচ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

করিলেন, অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই! তিনি এই বিষয় লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় পুনরায় দেখিতে পাইলেন—

হাড়িফা ভাঙ্গ সেবন করিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিলেন। বেলা আড়াই প্রহর অতীত হইল—তখন পঞ্চজন কামিনী আসিয়া তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিল। স্নানান্তে হাড়িফা পুনরায় ভাঙ্গচূর্ণ সেবন করিলেন। এইবার তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তিনি নারিকেল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির মানসে রাজার নারিকেল-বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া হুঙ্কার ত্যাগ করিবামাত্র উনশত নারিকেল, তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া প্রণাম বিজ্ঞাপিত করিল। হাড়িফা সেই উনশত নারিকেল, আম, কাঁটাল এবং বার হাজার তাল পাড়িয়া ভক্ষণ করিলেন। অবশিষ্ট যাহা রহিল, এবং দুগ্ধ ও কলা, সমবেত বালকবৃন্দমধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। এইরূপে এক হুঙ্কার দিয়া নারিকেল পাড়িতে লাগিলেন এবং অপর এক হুঙ্কার দিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আর এক হুঙ্কার দিবামাত্র, সেই সমস্ত নারিকেলের ডাল-মালা-শস্য একত্র হইয়া যথা-পূর্ব্ব সুবিন্যস্ত ও অক্ষুণ্ণ ভাবে, পুনর্ব্বার বৃক্ষের যথাস্থানে, যথাযথভাবে সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতে লাগিল!

গোপীচন্দ্র এই সব আলৌকিক ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া আছেন—ময়নামতী তাঁহাকে অবহিত করিবার

জন্য ইঙ্গিত করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার উপলব্ধি করিতে বলিয়া কহিলেন—'বৎস, হাড়িফার নিকটে এই সকল জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিলে, আর কখনও মৃত্যু হইবে না।' রাজা গোপীচন্দ্র তখন বলিলেন—'এমন জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারিলে, আমি যোগী হইতে প্রস্তুত আছি। আমি বাইশ-দণ্ডের রাজা হইয়াও কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিলে, তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে পারি না। কিন্তু এই হাড়িফা সামান্য নারিকেল লইয়া এরূপ অলৌকিক কর্ম্ম করিল!' ময়নামতী সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—'তুমি অচিরেই হাড়িফার মহাজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হও'।

ময়নামতী, গোপীচন্দ্রকে হাড়িফার অলৌকিক শক্তির আরও কিছু অতিরিক্ত পরিচয় প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়া, সেদিনও তাঁহাকে তাঁহার আলয়ে রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে, গোপীচন্দ্র সুবর্ণ-ভৃঙ্গারের সুবাসিত জলে বদনমণ্ডল প্রক্ষালন করিয়া স্বর্ণ খট্টায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নীলাই তাম্বূলিক পান লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাজার সাক্ষাতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। ময়নামতী দক্ষিণে বামে ইতস্ততঃ কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, নীলাই তাম্বূলির শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গোপীচন্দ্র জননীর এবংবিধ অদ্ভুত ও নৃশংস আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন - 'মা, আপনার এ কি-প্রকার ডাকিনীর ন্যায় ব্যবহার! বিনা কারণে তাম্বূলীর শিরশ্ছেদ করিয়া আপনি নরকে যাইবার

পথ প্রশস্ত করিলেন কেন ?' ময়নামতী বলিলেন—'তুমি আমার আচরণে অসন্তুষ্ট হইও না—তুমি এইমাত্র দেখিতে পাইবে, হাড়িফার পদস্পর্শে এই দ্বিখণ্ডিত দেহ পুনর্জীবন লাভ করিবে'।

হাড়িফা, 'বাঙ্গালা'-ঘরে 'লৌঙ্কে'র চন্দ্রাতপ-তলে বসিয়া আছেন—এমন সময়ে, ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া, স্কন্ধে তাম্বুলীর কবন্ধ এবং হস্তে মস্তকটি ঝুলাইয়া হাড়িফার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র, হাড়িফা হুঙ্কার ছাড়িলেন—সঙ্গে সঙ্গে আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন—তিনি দুই জনকে দুই কর্ণের দুই কুণ্ডল করিয়া লইলেন। তদনন্তর ময়নামতীর হস্তধৃত ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া বলিলেন—'আমি নারিকেল ভক্ষণ করিতে বড় ভালবাসি—আপনি আমার জন্য ত বেশ সুন্দর নারিকেল আনিয়াছেন' !

ময়নামতী ব্যগ্রভাবে বলিলেন—'আমি আপনার জন্য নারিকেল উপঢৌকন আনি নাই—এটি, একটি রমণীর ছিন্নমুণ্ড। রাজা গোপীচন্দ্র, এই তাম্বুলীর দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার জ্ঞানের পরীক্ষা গ্রহণ জন্য আপনার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি যদি এই কবন্ধে মস্তক সংযুক্ত করিয়া ইহার জীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, গোপীচন্দ্র আপনার নিকটে ভক্তি-প্রণত হইয়া জ্ঞান শিক্ষা করিবে'।

অদূরে অনন্তবিস্তৃত সাগর—দ্রুতগামী পক্ষী ছয়মাস অবিরত উড়িয়াও কূলকিনারা পায় না। তাহার অতলস্পর্শিনী গভীরতা—প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে ছয়মাসেও তাহা তল স্পর্শ করিতে পারে না। ময়নামতীর বাক্যে উৎসাহিত হইয়া হাড়িফা, সেই কবন্ধ ও মস্তক লইয়া অনায়াসে, এক হাঁটু জলের ন্যায়, পদব্রজেই মধ্য-সাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র গঙ্গাদেবী তাঁহার উপবেশন জন্য খট্টা আনিয়া দিলেন। খট্টায় উপবেশন করিয়া তিনি উত্তরে কবন্ধ এবং দক্ষিণে মুণ্ডটি স্থাপন করিলেন। তদনন্তর তিনি ধ্যানস্থ হইয়া গোরক্ষ মন্ত্রসিদ্ধা স্মরণ করিবামাত্র, বসুমতী উলটিয়া পড়িলেন। তখন স্থির-মন্ত্র পাঠ করিয়া বসুমতীকে বলিলেন—'আপনি কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া থাকুন — আমি মেহারকুলের রাজা গোপীচন্দ্রকে পরীক্ষা দেখাইব'। এই বলিয়া এক হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নমুণ্ড কবন্ধে সংলগ্ন হইয়া গেল! মৃতদেহ পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইলে, তিনি এক পদাঘাত করিলেন—হাড়িফার পদ-সংস্পর্শে মৃত মনুষ্য জীবিত হইয়া উঠিল এবং ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। গোপীচন্দ্র এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াও, হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না।

রাজা গোপীচন্দ্র, হাড়িফার অলৌকিক শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য

কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি রাজ-পরিচ্ছদ ও সুবর্ণমুষ্টি তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সামান্য পরিধেয়মাত্র গ্রহণ করিলেন এবং হাড়িফার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সাতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরিলেন। তদনন্তর করজোড়ে বলিলেন—'আমার জননী নিয়তই ব্রহ্মজ্ঞান সাধনা করিবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু সে জ্ঞান আমায় কে শিক্ষা দিবে? আমার প্রার্থনা, আপনিই আমার গুরু হইয়া আমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দান করুন। আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হই'।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য গোপীচন্দ্রের সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়া হাড়িফা স্নেহসহকারে বলিলেন—'আমি হাড়ি, আমার চরণে প্রণাম কেন? আমি পশুশালায় খাটিয়া কালাতিপাত করি—সর্ব্বদাই অশুচি থাকি—কখনও স্নান করি না—আমায় কিরূপে গুরুজ্ঞান হইবে? আপনি রাজা—আমি ভিখারী; আপনি অগণিত রাণীসহ অট্টালিকায় বিলাসকক্ষে ভোগসুখে প্রমত্ত আছেন—আর আমি ভিক্ষা করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করি—নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান পর্য্যন্ত নাই—বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। শীতকালে গাত্রাবরণ থাকে না—মাঘ মাসের দারুণ শীতে যখন পাষাণ পর্য্যন্ত খসিয়া যায়—সেই প্রচণ্ড শীত কেবলমাত্র ভস্ম মাখিয়া সহ্য করি। চারিমাস গ্রীষ্মে অনলের মত রৌদ্রে যখন গাত্র-চর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়—তখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদর

পূর্ণ করিতে হয়। আপনি অতুল বৈভবের একমাত্র অধিকারী—আপনি কেন যোগি-সন্ন্যাসী হইয়া এত কষ্ট সহ্য করিবেন? শীতল চন্দনপ্রলেপ ও শ্বেত-চামর ব্যজনের পরিবর্ত্তে আপনি ভস্ম মাখিবেন কেমন করিয়া? শরীরে তৈল নাই—গাত্রে বস্ত্র নাই—কন্থামাত্র সম্বল করিয়া ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়া, আপনি কি যেখানে সেখানে আমাদের ন্যায় নিয়ত ভ্রমণ করিতে পারিবেন?

হাড়িফার এবংবিধ প্রতিকূল মন্তব্য শ্রবণ করিয়া গোপীচন্দ্র করজোড়ে বলিলেন—'আপনি আমায় আর ছলনা করিবেন না। আমি এতদিন না বুঝিয়া ঘোর অপরাধ করিয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক, আমার অজ্ঞতা-জনিত সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আপনার অভয় আশ্রয় দান করুন। আমি কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া, আপনার সহিত অনুচররূপে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব—আপনি আমার প্রতি সদয় হউন'।

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণে যথার্থ আগ্রহ জন্মিয়াছে বুঝিয়া হাড়িফা তাঁহাকে বলিলেন—"তোমার যখন সত্যসত্যই মনে বিকার জন্মিয়াছে, তখন আমি তোমাকে শীঘ্রই 'ব্রহ্মজ্ঞান' প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইব না। অপাততঃ তুমি কিছু ভিক্ষা মাগিয়া আমার নিকটে আনয়ন কর"।

গোপীচন্দ্র হাড়িফার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আশ্বস্ত ও চরিতার্থ হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড—সন্ন্যাস

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

'যোগী যদি হবে রাজা হও দেশান্তরী'।
'দেশের যোগী হৈলে রাজা ভিক্ষা নাহি পায়'।

গোপীচন্দ্রের ভিক্ষা

সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া এবং কর্ণযুগলে কুণ্ডল ও হস্তে ভিক্ষার থালা ধারণ করিয়া রাজা গোপীচন্দ্র যোগীর ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। আজ তিনি হাড়িফার আদেশে, নগরে ভিক্ষার্থে বহির্গত হইবেন।

এদিকে হাড়িফা, রাজা গোপীচন্দ্রকে বিদায় দিয়া আপন 'গম্ভীরা' বা গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে মায়াবশে এক দৈবজ্ঞের রূপ ধারণ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দৈবজ্ঞ-বেশে হাড়িফা প্রত্যেক নগরবাসীকে কহিয়া দিলেন—'আমি পঞ্জিকা গণনা করিয়া দিব। দেখিতে পাইতেছি, অনতিবিলম্বে এক সুন্দর তরুণবয়স্ক যোগী এই নগরে ভিক্ষা করিতে আসিবে। সে অত্যন্ত মায়াবী—আমি বিশেষ সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাহার মায়ায় ভুলিলে, তোমরা বিশেষ কষ্ট পাইবে। সেই যোগীর এমনি প্রভাব যে, সে যাহার দিকে নেত্রপাত করিবে, তাহার সমস্ত ধন-ধান্য তৎক্ষণাৎ কোথায় কোন শূন্য পথে উড়িয়া যাইবে। সুতরাং,

যাহাতে সে তোমাদের দ্বারদেশে আগমন করিতে না পারে, পূর্ব্ব হইতেই তদ্বিষয়ের সমুচিত ব্যবস্থা করিবে—দ্বারের সম্মুখে কণ্টক বিস্তার করিয়া, শিকারী কুকুর প্রহরী নিযুক্ত রাখিবে। সে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইবে—তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া ত দূরের কথা, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে'। নগরবাসিগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া দৈবজ্ঞবেশধারী হাড়িফা অন্তর্ধান হইলেন।

হাড়িফার এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারের কথা গোপীচন্দ্র ঘূণাক্ষরেও কিছু জানিতে পারিলেন না। তিনি নগরে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া দেখিলেন—নগরবাসিগণ সকলেই আপন আপন বহির্দ্বার কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তথায় 'দুই কাণ লোটা শিকারা কুকুর পাহারা দিবার জন্য বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং, তিনি কাহারও দ্বারদেশের সান্নিধ্যে আগমন করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে সাহসী হইলেন না এবং তাহারাও, যোগীর ছদ্মবেশ পরিধান করায়, রাজা গোপীচন্দ্রকে চিনিতে পারিল না। এখন দৈবজ্ঞের নির্দ্দেশমত তরুণ যোগীর আবির্ভাব দেখিয়া তাহারা সকলেই সতর্ক হইল এবং ভিক্ষার পরিবর্ত্তে তাহার প্রতি শিকারা কুকুর 'লাগাইয়া' দিল। গোপীচন্দ্র নগরের সর্ব্বত্র ভিক্ষার পরিবর্ত্তে কুকুরের বিকট আস্ফালন, তাড়না ও চীৎকার সহ্য করিয়া শূন্যহস্তে বিষণ্ন মনে অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

'সমগ্র নগর পরিভ্রমণ করিয়া একমুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না—গুরুর নিকটে রিক্তহস্তে কোন্ মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিব—তিনি আমায় কি বলিবেন'—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গোপীচন্দ্রের দুই চক্ষু বহিয়া শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদনন্তর তিনি স্বীয় প্রাসাদদ্বারে গমন করিয়া, ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন। উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ভিক্ষার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অদুনা পদুনা ভিক্ষা লইয়া আসিলেন। কিন্তু তরুণবয়স্ক যোগীকে দেখিয়া তাঁহারা বিমুখ হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ময়নামতীর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'দ্বারদেশে এক তরুণ যোগী ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছে—আপনি স্বয়ং তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া আসুন।' ময়নামতী ধ্যানস্থা হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যোগী তাঁহার পুত্র গোপীচন্দ্র ভিন্ন অপর কেহ নহে।

ময়নামতী তখন সুবর্ণ থালায় তণ্ডুল, কড়ি, হরিদ্রা, লবণ ইত্যাদি সুসজ্জিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে যোগীর সমীপস্থা হইলেন। ময়নামতী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াও যেন চিনিতে পারিলেন না—এইরূপ ভাণ করিয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে একসঙ্গে বহুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আপনি অতি তরুণ বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ

করিয়াছেন। আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন—আপনার আশ্রম কোথায় ? আপনি কি যোগসাধন করেন এবং কোন্ তীর্থে অবস্থান করেন ? আপনার আদ্য গুরু কে—আপনি কাহার শিষ্য ? আপনি এই তরুণ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন কেন ? দুর্গন্ধ বা সৌরভের উৎপত্তি কোথায়—নিদ্রিত হইলে প্রাণপুরুষ কোন্ ঘটে অবস্থিতি করে ? বৃক্ষের পত্রসংখ্যা এবং বর্ষার ধারাসংখ্যা কত ? নদীতে বালি ও আকাশে তারকার সংখ্যা কত ? চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাসকল দিবানিশি কোথায় অবস্থিতি করেন ? পৃথিবীর উৎপত্তি কোথায়—স্থিতি কোথায় ? মানুষ মরেই বা কেন—জন্মগ্রহণই বা করে কেন ? কাটিলে জীবন হয়—না কাটিলে মরে, এ কি রহস্য ? জননী-জঠরে শিশু কি করে' ? ঝটিকাপ্রবাহের ন্যায় এবংবিধ প্রশ্নবৃষ্টির পর ময়নামতী বলিলেন—'আপনি যোগী হইয়াছেন—আমার এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রদান করিয়া আপনার জন্য আনীত এই ভিক্ষা-দ্রব্যগুলি গ্রহণ করুন।'

ময়নামতীর এই প্রশ্নপরম্পরা শ্রুত হইয়া ছদ্মবেশী রাজা গোপীচন্দ্র একবারে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি এই সকল জটীল প্রশ্নাবলীর সঙ্গে সঙ্গে কি সদুত্তর প্রদান করিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া, মনে মনে হাড়িফার চরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এখানে 'গম্ভীরা'-মধ্যে হাড়িফার আসন টলিল—তিনি তৎক্ষণাৎ গোপীচন্দ্রের

নিকটে 'ব্রহ্মজ্ঞান' প্রেরণ করিলেন। 'ব্রহ্মজ্ঞান' নিমেষমধ্যে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া গোপীচন্দ্রকে আশ্রয় করিল। গোপীচন্দ্রের মায়ামোহ কাটিয়া গেল—তিনি দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল ত্রিভুবন নখদর্পণের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন—'সংসার মায়াময়—জলবিম্বের ন্যায় সমস্তই মিথ্যা। মানুষ এই মায়াজালে বন্দী হইয়া সামান্য কালমাত্র জীবন ধারণ করে—পরে আবার লয়প্রাপ্ত হয়। ইষ্ট-মিত্র, বন্ধুবান্ধব এ সকলও বাজীকরের কাষ্ঠ-পুত্তলীর ন্যায় অলীক ও সাময়িক ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র!'

গোপীচন্দ্র 'ব্রহ্মজ্ঞান' প্রাপ্ত হইয়া, তৎপ্রভাবে সংজ্ঞাহীন হইলেন এবং কিছুক্ষণ নীরব রহিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে যেন কাহার কথার প্রতিধ্বনিস্বরূপ এইভাবে ময়নামতীর প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন—

'মা, আমরা শূন্য হইতে আসিয়াছি—আমাদের স্থিতি এই পৃথিবীতে। আমার আদ্য-গুরু—জন্মদাতা, সিদ্ধা গুরু—জননী এবং জ্ঞান-গুরু—জলন্ধরী সিদ্ধা হাড়িফা। মনুষ্যের নব-যৌবন জোয়ারের জলের ন্যায়—এ জীবন মিথ্যা—কায়াখানি ভস্মে পরিণত হইবে। যাবতীয় গন্ধসৌরভ আমরা নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করি। আমরা নিদ্রিত হইলে আমাদের প্রাণপুরুষ 'গুপ্ত-গৃহে' আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃক্ষের পত্র—এক, বরিষার ধারা—এক, নদীর বালি—এক, আকাশের

তারা—এক। জলস্থল, আকাশ ও চন্দ্র-সূর্য্য আপনিই প্রকাশিত হইয়াছে। জীবের মৃত্যুই সত্য—জীবনের আবার আশা কি? জন্মকালে নাড়ীচ্ছেদ হইলেই স্বতন্ত্র জীবন-প্রাপ্তি ঘটে, নচেৎ প্রাণ বিনষ্ট হয়। জননীজঠরে দশমাস বন্দী-অবস্থায় পবনমাত্র আহারে শিশুর শরীর সংরক্ষিত হয়।'

ময়নামতী, গোপীচন্দ্রের প্রশ্নাবলীর সুষ্ঠু সমাধান ও সদুত্তর শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভিক্ষা প্রদান করিয়া বলিলেন—'আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই দেশে স্থায়িভাবে অবস্থান করুন—আমি আপনার জন্য গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া দিব, পরিধানের বস্ত্র দিব—নিত্য ভিক্ষা প্রদান করিব; হস্তে সুবর্ণের থালা এবং কর্ণে সুবর্ণের কুণ্ডল দান করিব—আপনি এই দেশে অবস্থিতি করুন।'

ময়নামতীর এইরূপ কপটতাপূর্ণ বাক্যজালে বিব্রত হইয়া যোগিবেশী গোপীচন্দ্র গুরুস্মরণপূর্ব্বক বলিলেন—'আপনি আমায় ধনৈশ্বর্য্যের প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছেন কেন? আমি লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া জীবিকার্জ্জন করি—বৃক্ষতলে বাস করি। রত্ন-কাঞ্চন রাজার পক্ষেই শোভা পায়—আমরা জন্ম-ভিক্ষু, আমাদের এ সকলে প্রয়োজন কি? ধনই যত আপদ্ ও অনিষ্টের মূল—ধন হইতে ভোগ এবং ভোগ হইতে রোগের উৎপত্তি। আমরা পথের ভিখারী—সর্ব্বদাই যোগ-সাধনায় লিপ্ত থাকি—

আমরা ধন লইয়া কি করিব ?—ধন আমাদের বিষবৎ পরিত্যাজ্য' ?

গোপীচন্দ্রের এইরূপ নির্ব্বেদ-সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া ময়নামতী সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং হাড়িফার চরণ আশ্রয় করিয়া দেশান্তরিত হইবার জন্য তাঁহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তদনন্তর গোপীচন্দ্র, ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্যাদি সহ হাড়িফার 'গম্ভীরা'-উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। এদিকে হাড়িফা, ধ্যান-যোগে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং সমাধিস্থ হইয়া এক হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন। এখানে রাজা গোপীচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন—ফলে, ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্যাদি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। অল্পক্ষণমধ্যেই চৈতন্যলাভ হইলে, গোপীচন্দ্র হস্ত-প্রসারণ করিয়া ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্যাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু হাড়িফার হুঙ্কারে পৃথিবী বিদীর্ণা হইয়া গেলে, তৎসমুদয় তাহার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে—এখন অনুসন্ধান করিলে পাইবেন কোথায় ?

রাজা গোপীচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া রিক্তহস্তে সাশ্রু-নয়নে হাড়িফার নিকটে উপস্থিত হইলেন। গোপীচন্দ্রকে দেখিয়া হাড়িফা বলিলেন—'তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর ; কৈ, আজ নগরে কি ভিক্ষা সংগ্রহ করিলে ?—দেখি।' গোপীচন্দ্র অশ্রুসিক্তনয়নে সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিয়া

বলিলেন—‘আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে ?—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিলাম—কেহ একমুষ্টি তণ্ডুল দিল না—পরন্তু কুকুরের তাড়না ও কণ্টকের যন্ত্রণা সহ্য করা সার হইল ! অবশেষে বহু যত্ন ও কষ্টে রাণী ময়নামতীর নিকটে কিছু ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমার কর্ম্ম-দোষে তাহাও ভূমিতে পতিত হইয়া মেদিনী-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে’ !

গোপীচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া জলন্ধরী হাড়িফা বলিলেন—‘রাজন্, আপনি বিজ্ঞ, আপনিই বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখুন, এ দেশে কেহ আপনাকে ভিক্ষা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সম্মত নহে। সুতরাং, আপনি এখন বেশ বুঝিতেছেন,—দেশের যোগী হইয়া দেশে অবস্থান করিলে, সে তথায় কখনই ভিক্ষা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় না !

রাজা গোপীচন্দ্র, হাড়িফার সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া করযোড়ে বলিলেন—‘আপনার এই অমূল্য উপদেশ, আমি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। এখন আপনি যথায় আদেশ করিবেন, আমি সেই দেশেই চলিয়া যাইব। এ দেশে থাকিবার আমার আর বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই।’

বিংশ পরিচ্ছেদ

'কোন্ দিনা রাজার বেটা সিলাইবে খুলি কাঁথা।
কোন্ দিনা রাজার বেটা মুড়াইবে মাথা॥
কোন্ দিনা মহারাজ ভূসঙ্গ মাখিবে।
কোন্ দিনা ধর্ম্মী রাজা ডোরকৌপীন পরিবে॥'

সন্ন্যাস-গ্রহণের দিনস্থির

গোপীচন্দ্রের হৃদয়াকাশ হইতে সংশয়-মেঘ বা মোহাবরণ একবারে অপসৃত হইয়াছে—তাঁহার হৃদয় এখন নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর হইয়াছে—সার-সত্যের উজ্জ্বল আলোক-রেখাসম্পাতে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। তিনি এখন দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিয়া অমৃতের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহারই সান্নিধ্য লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায়, সংসারের সর্ব্ববিধ সুখভোগ ও বিলাসবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন।

শীতার্ত্ত মানব বহুবস্ত্রবিজড়িত রহিয়াও অতিরিক্ত বস্ত্রের জন্য লালায়িত হয়; আবার গ্রীষ্মাগমে তৎসমুদয় নিদারুণ ক্লেশের কারণবোধে, দূরে নিক্ষেপ করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকে। রাজা গোপীচন্দ্র এতদিন সংসারের যাবতীয় ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দ্বারা নিবিড়ভাবে পরিবৃত রহিয়াও, পূর্ণভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না—আরও ভোগ, আরও বিলাসের জন্য নিয়তই সমুৎসুক রহিতেন। এখন তাঁহার মনে যথার্থ বৈরাগ্য উপস্থিত

হইয়াছে—তাঁহার হৃদয়ে উদ্দীপনার এবং মনে উত্তেজনার আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং তিনি এতদিন যাহাদিগকে জীবনের একমাত্র উপভোগ্য ও অবলম্বনীয় বিবেচনা করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, এখন তাহাদিগকেই দূরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ ভাবে জীবন যাপন করিতে অতিমাত্রায় প্রয়াসী হইলেন। ভোগে তৃপ্তি নহে, লালসার বৃদ্ধিমাত্র—এ কথা গোপীচন্দ্র এতদিন বুঝিতে পারেন নাই। এখন তিনি সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিলেন—ত্যাগেই পরমা তৃপ্তি এবং লালসার বিলোপ। যাঁহার হৃদয়ে এই সার-সত্যের বিকাশ হইয়াছে, তিনি কি আর ক্ষণমাত্রও এই ভোগায়তনের মধ্যে অবস্থান করিতে পারেন? গোপীচন্দ্র এখন যথাসম্ভব শীঘ্র গৃহত্যাগের জন্য যথাযোগ্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি খেতুয়াকে, সন্ন্যাস-গ্রহণোপযোগী দিন স্থির করিবার জন্য রাজ-দৈবজ্ঞকে অচিরে আহ্বান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এ দিকে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প, অন্তঃপুরমধ্যে মহিষীবৃন্দের নিকটে অধিকক্ষণ অপরিজ্ঞাত রহিল না। তাঁহারা এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণে হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন না—জলমগ্ন ব্যক্তির তৃণাশ্রয় লাভের নিরর্থক চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল প্রয়াসে ব্রতী হইলেন। সন্ন্যাসগ্রহণোপযোগী শুভদিন নির্ণয়ের জন্য রাজ-দৈবজ্ঞের আহ্বান-বার্ত্তা শ্রবণ-গোচর হইবামাত্র, তাঁহারা দৈবজ্ঞ-

পত্নীকে পাঁচশত তঙ্কা উৎকোচ-স্বরূপ প্রদান করিয়া কহিলেন—'ঠাকুরাণি, সন্তানের জনক হইবার পূর্ব্বে, রাজা যাহাতে সন্ন্যাস গ্রহণ না করেন, আপনি দৈবজ্ঞ-ঠাকুরকে বলিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দি'ন। কৃতকার্য্য হইলে, আপনাকে আরও অধিক পুরস্কার প্রদান করিব।' দৈবজ্ঞপত্নীর সমগ্র জীবনে কখন এতগুলি তঙ্কা একত্র দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং এতগুলি তঙ্কার মায়া তাহাকে অনায়াসেই বশীভূত করিয়া ফেলিল। মহিষীবৃন্দের উপদেশমত, দৈবজ্ঞপত্নী নিত্য অস্বচ্ছলতার কথা স্মরণ করাইয়া দৈবজ্ঞ-ঠাকুরের নিকটে তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

যথাসময়ে গোপীচন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দৈবজ্ঞ-ঠাকুর ধবল রেশমবস্ত্র পরিধান ও এক 'জোড়া' পৈতা গলদেশে ধারণ করিয়া, বক্ষে পাঞ্জি পুথি সহ রাজ-সভা-উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে শূন্য কলসী, 'মেলা-চুল' নয়ন-গোচর হইল। চন্দনবৃক্ষোপরি কাকের নিষেধ-সূচক ধ্বনি হইল—কিন্তু এ সকল মানা করিতে গেলে রাজাদেশ প্রতি-পালিত হইবে না। সুতরাং দৈবজ্ঞ-ঠাকুর এই অমঙ্গল-সূচক ঘটনা বা দৃশ্যাবলী উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।

রাজা গোপীচন্দ্র রাজসভায় বসিয়া আছেন। অগণিত পাত্র-মিত্র প্রভৃতি পারিষদবর্গ ও জনগণের সমারোহে রাজ-

সভা পরিপূর্ণ। রাজা গোপীচন্দ্র, দৈবজ্ঞ-ঠাকুরকে দেখিবা-মাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রণামান্তে যথোচিত সমাদরসহকারে পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট করাইয়া বলিলেন—'দৈবজ্ঞ-চূড়ামণি, আপনি আমার সন্ন্যাস-গ্রহণের উপযুক্ত কাল নির্ণয় করিয়া দি'ন। আমি কোন্ দিন কখন ঝুলিকাঁথা সেলাই করিব, কোন্ দিন কখন মস্তক মুণ্ডন করিব—কোন্ দিন অঙ্গে ভস্ম-বিলেপন করিব, কোন্ দিন কর্ণচ্ছেদ করিব, কোন্ দিন ডোর-কৌপীন আশ্রয় করিব, কোন্ দিন 'দোয়াদশ' ধারণ করিব এবং কোন্ দিন বা আমি দেশান্তরে গমন করিব?—আপনি এই সকল বিষয় সূক্ষ্মভাবে গণনা করিয়া আমায় কহিয়া দি'ন।'

দৈবজ্ঞ-ঠাকুর রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত গণনা করিবার ভাণ করিয়া বহুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। তিনি, এই অত্যল্পক্ষণমাত্র পূর্ব্বে রাণীগণের নিকট হইতে যে প্রচুর অর্থ উৎকোচস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং কৃতকার্য্য হইলে, ভবিষ্যতে যে আশাতীত পুরস্কারের লোভে প্রলুব্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা নিতান্তই অসম্ভব হইল। তিনি নিঃসঙ্কোচে রাজা গোপীচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'মহারাজ, বর্ত্তমান বর্ষ সন্ন্যাসগ্রহণের প্রশস্ত কাল নহে। বিশেষতঃ, আপনার কোষ্ঠীর ফলাফল বিচার করিয়া দেখিতেছি—

আপনি এক সন্তানের জনক না হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, উহা আপনার পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক হইবে না'।

এক্ষণে গোপীচন্দ্রের মানসিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে তাঁহাকে সন্ন্যাসগ্রহণের যে কোনরূপ প্রতিবন্ধক হউক না কেন, অতিমাত্রায় উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে। এখন প্রতিকূল মন্তব্য তাঁহার নিকটে বিষবৎ পরিত্যাজ্য এবং অনুকূল মন্তব্য অমৃতবৎ আদরণীয়। এতদ্ব্যতীত রাজা গোপীচন্দ্র স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে, দৈবজ্ঞের উৎকোচগ্রহণের কথা বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ খেতুয়া গোলামকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন—'এই উৎকোচগ্রাহী কৃতঘ্ন ভণ্ড দৈবজ্ঞটাকে চণ্ডিকাদেবীর প্রাঙ্গণে লইয়া বলিপ্রদান কর—ইহার এরূপ গুরুতর পাপের ইহাই সমুচিত দণ্ড'। মুহূর্ত্তমধ্যে দৈবজ্ঞকে চণ্ডীকার প্রাঙ্গণে আনয়ন করা হইল। রাজাজ্ঞা অবিলম্বে প্রতিপালিত হইবার উপক্রম দেখিয়া দৈবজ্ঞ যূপকাষ্ঠের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কম্পান্বিত-কলেবরে চণ্ডিকাদেবীর করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। চণ্ডীর দয়া হইল—তিনি 'মুনিমন্ত্র' জপ করিয়া শ্বেত মক্ষিকার রূপ ধারণপূর্ব্বক দৈবজ্ঞ-ঠাকুরের কর্ণে উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যখন ষোল জন 'পাষণ্ড' দৈবজ্ঞকে বলিদান করিতে উদ্যত, সেই সময়ে তিনি রাজার নিকটে কাতর-ক্রন্দনে প্রাণভিক্ষা করিয়া বলিলেন—'আমার নাবালক পুত্র আমার অজ্ঞাতসারে পঞ্জিকাখানি অশুদ্ধ করিয়া

দিয়াছিল—সেইজন্য এইরূপ গণনাবিভ্রাট ঘটিয়াছে। আমায় মুক্তি প্রদান করুন—এইবার আমি ঠিক্ গণনা করিয়া দিব'। দৈবজ্ঞের অজস্র অশ্রুপাত দর্শনে রাজার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল—তিনি, প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিলেন এবং যথার্থরূপ গণনা করিয়া কালনির্ণয়ের আদেশ প্রদান করিলেন।

দৈবজ্ঞ-ঠাকুর এইবার বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক গণনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া বিবিধপ্রকার অঙ্ক ও রেখাপাতের পর বলিলেন—'আগামী মঙ্গলবার দিন ঝুলিকাঁথা সেলাই, বুধবার দিন মস্তকমুণ্ডন, বৃহস্পতিবার দিন ভস্মবিলেপন, শুক্রবার দিন কর্ণদ্বয়চ্ছেদন, শনিবার দিন ডোরকৌপীন ধারণ এবং রবিবার দিন 'দোয়াদশ' হস্তে লইয়া বিদেশ-যাত্রা করিলে শুভ হইবে'। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দিন স্থির করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—তিনি ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ রাজাকে বলিলেন—"আপনি নানারূপ লোভে প্রলুব্ধ হইয়া প্রথমতঃ বাটীর বাহির হইবেন; কিন্তু অবশেষে নানারূপ দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিবেন। আপনি গণিকা-গৃহে 'বান্দী' হইয়া নানারূপ নীচকর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবেন। বস্ত্রের পরিবর্ত্তে 'বারগাঁইট'যুক্ত ধড়ামাত্র পরিধান করিবেন। 'আকাঁড়া ধানের চাউল' এবং 'বিচিয়া বার্ত্তকী' মাত্র ভোজন করিতে পাইবেন—গণিকাদ্বারে সম্মার্জ্জনীদ্বারা প্রহৃত হইবেন—

দৈনিক 'বার ভার' করিয়া জল বহিতে আপনার শরীর ক্ষীণ হইয়া যাইবে, ইত্যাদি"।

কিন্তু রাজা গোপীচন্দ্র, দৈবজ্ঞের ঈদৃশ ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি বলিলেন—"ঠাকুর, মানুষের সুখ দুঃখ, অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। বিধাতা, ভাগ্যে 'আড়াই অক্ষর' যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা কোনক্রমেই খণ্ডিত হইবার নহে"। এই বলিয়া খেতুয়াকে আহ্বান করিয়া দৈবজ্ঞকে দান-দক্ষিণা প্রদানান্তর বিদায় করিবার আদেশ দিলেন। দৈবজ্ঞ-ঠাকুর অক্ষতদেহে প্রচুর দান-দক্ষিণাসহ সভা ত্যাগ করিতে পাইয়া, নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

'যেন মতে রাজার মাথায় তুলি দিল জল।
রাজ্যভূম সিংহাসন করে টল্‌মল্‌ ॥'
'চৌদ্দ আঙ্গুল কাপড় ফাড়ি কপ্নি সাজাইল।
আড়াই আঙ্গুল ফাড়িয়া এ ডোর সাজাইল ॥'

সন্ন্যাস-গ্রহণ

সন্ন্যাসগ্রহণের নির্দ্দিষ্ট কাল সমাগত হইল। রাজা গোপীচন্দ্র মস্তক-মুণ্ডন, কর্ণচ্ছেদ, ডোর-কৌপীনধারণ প্রভৃতি যথাবিধ অনুষ্ঠানের পর আজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।

রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া নরসুন্দর 'ক্ষুর-ভাঁড়' সহ রাজ-সভায় উপস্থিত হইল। রাজা পারিষদবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময়ে নরসুন্দরকে দেখিবামাত্র তিনি সিংহাসন ও সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তি তাঁহার অনুগমন করিল। রাজা, সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইবামাত্র 'নাট্যমন্দির', 'দালানকোঠা' প্রভৃতি সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়া গেল!

রাজা গোপীচন্দ্র আজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চলিয়াছেন—দেশের প্রজামণ্ডলীর আজ দুঃখের অবধি নাই! সর্ব্বত্রই বিষাদের করুণচ্ছবি!—তরুগুল্ম, লতাপাতা পর্য্যন্ত যেন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে! বনের হরিণ হরিণী রাজার

শোকে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে—খেয়াঘাটে বাইশ কাহন নৌকা, তেইশ কাহন দাঁড়ী এবং বিশ্বম্ভর কাণ্ডারী সকলেই রাজার শোকে একান্ত মুহ্যমান হইয়া ক্রন্দন করিতেছে! পিঞ্জরস্থ শারীশুক, দ্বার-রক্ষক নয়বুড়ি শিকারী কুকুর আহার পরিত্যাগ করিয়া নিদারুণ শোকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছে! দপ্তরখানা, তোষাখানা, বালাখানা, 'জলটুঙ্গি'—এ সকল যেন নিতান্ত শ্রীহীন হইয়া উদাসভাবে শূন্য-হৃদয়ে শূন্যের প্রতি শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া অসহ্য শোক বিজ্ঞাপিত করিতেছে! হাতীশালায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া, গোশালায় গাভী ক্রন্দন করিতেছে! অন্তঃপুরে অদুনা পদুনা প্রভৃতি নয়বুড়ি রাণী ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন-রোলে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছেন—তাঁহাদের করুণক্রন্দনে পাষাণ গলিয়া যাইতেছে—অজস্র অশ্রুধারায়, তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত হইয়া যাইতেছে! চতুর্দ্দিকে বিষাদের ঘনচ্ছায়া! স্থাবরজঙ্গম, পশুপক্ষী, প্রজাসাধারণ, পাত্রমিত্র, সর্ব্বোপরি অন্তঃপুরস্থ মহিষীবৃন্দ—সকলেই সমভাবে বিক্ষুব্ধ ও ম্রিয়মাণ, সকলেই আশু বিরহের অসহ্য যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জনদ্বারা তাহা প্রশমিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে! কিন্তু ময়নামতীর চক্ষে জল নাই—হৃদয়ে শোকের লেশমাত্র নাই! তথাপি কি করিবেন?—সকলের ক্রন্দন দেখিয়া লজ্জাবশতঃ নামমাত্র ক্রন্দন করিয়া চক্ষে বারিসিঞ্চন করিলেন।

গোপীচন্দ্র মস্তকমুণ্ডনার্থ উপবেশন করিলে, রাণী ময়নামতী একঝারি গঙ্গাজল ও একটি কোমল কদলী-পত্র আনিয়া দিলেন। তদনন্তর তিনি সুবর্ণপাত্রে জল লইয়া রাজার মস্তকে যেমন সিঞ্চন করিলেন, অমনি গোপীচন্দ্রের ‘রাজ্য-ভূম’ ও সিংহাসন টলমল্ করিয়া উঠিল।

ক্ষৌরকার শাণিত খুর সহ রাজার সম্মুখে বসিয়া, আজ্ঞার প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছে—সাহস করিয়া রাজার মস্তক-মুণ্ডনে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না! ময়নামতী মস্তক-মুণ্ডনে ক্ষৌরকারের সঙ্কোচ বুঝিয়া তাহাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন—“নাপিতের পো’—তুমি আবার কাহার অপেক্ষায় ইতস্ততঃ করিতেছ? আমার ‘যাদুর’ মস্তক-মুণ্ডন করিতে ঘৃণা করিও না। তুমি নিঃসঙ্কোচে মস্তক মুণ্ডন কর—আমি তোমার ক্ষুরের বাঁট হীরা দিয়া মণ্ডিত করিয়া দিব এবং তোমার কার্য্যের ‘চিহ্ন’ বা পুরস্কারস্বরূপ একটি মাণিক উপহার প্রদান করিব। আর বিলম্ব করিও না—কেশ-মুণ্ডনে অগ্রসর হও। কেবলমাত্র ‘ব্রহ্ম-চুল’ বা শিখা ব্যতীত মস্তকের সমগ্র কেশ মুণ্ডন করিয়া দাও”।

ময়নামতীর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষৌরকার-নন্দন রাজার সিক্ত-মস্তকে একবার, দুইবার ক্ষুর-চালনা করিল। তৃতীয় বার ক্ষুরচালনার ফলে, মুণ্ডিত কেশরাশি ভূমিতলে পতিত হইবামাত্র, সেইস্থান হইতে তদ্দণ্ডেই ‘কেশী-গঙ্গা’ নদীর উদ্ভব হইল এবং উহা তরতর-শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ

মধ্যে রাজার, শিখাগুচ্ছ ব্যতীত, সমগ্র নবনীতকোমল কুঞ্চিত কেশরাশি ভূমিতলে পতিত হইল। রাজা, মুণ্ডিত-মস্তক হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ-মণ্ডিত রূপ-লাবণ্য দেখিয়া আশু বিরহের আশঙ্কায় অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

এদিকে ময়নামতী, তুড়্-তুড়্ শব্দে হুঙ্কার ছাড়িবামাত্র ষোলশত মুনি সন্ন্যাস-গ্রহণের ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দীক্ষা-গুরু গোরক্ষ-বিদ্যাধর পুষ্পক-রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন— ঢেঁকীবাহনে নারদ-ঋষি, বৃষভবাহনে ভোলা মহেশ্বর, 'ধনুকে ভর' করিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঞ্চপাণ্ডব শুভাগমন করিলেন। এতদ্ব্যতীত কত কাণকাটা, কাণফাটা, ইন্নাথ, ভিন্নাথ, যোগী, সিদ্ধা প্রভৃতির আবির্ভাব হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এইবার রাজার কর্ণচ্ছেদ হইবে। গোপীচন্দ্র পাঁচ 'লোটা' কূপোদকে স্নান করিয়া 'ঘুঁটের ছাই' দিয়া বদন আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ময়নামতী এইবার সত্য সত্যই ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণ মধ্যেই আত্মসংবরণ করিয়া তিনি নাপিতের হস্ত হইতে ক্ষুর গ্রহণপূর্ব্বক কর্ণচ্ছেদকারী কাণ-ফাড়ার হস্তে প্রদান করিলেন—কাণফাড়া, 'রাম-রাম' বলিয়া রাজার কর্ণযুগল 'ফাড়িয়া' দিল।

কর্ণচ্ছেদ হইলে রাজার কর্ণে, স্ফটিকের কুণ্ডল প্রদত্ত

হইল। তদনন্তর ময়নামতী, এক খানি বস্ত্র আনিয়া হাড়িকার হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি পঞ্চজন বৈষ্ণবের সহায়তায় আড়াই হাত পরিমিত বস্ত্রে বহির্বাস ও সওয়া তিন হাত বস্ত্রে 'রাম-খিলিকা' প্রস্তুত করিয়া রাজার গলায় তুলিয়া দিলেন এবং চৌদ্দ-অঙ্গুলি বস্ত্রে কৌপীন ও আড়াই-অঙ্গুলি বস্ত্রে ডোর প্রস্তুত করিয়া রাজাকে ডোরকৌপীন ধারণ করাইলেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার পানাহারের জন্য একটি কদু বা লাউএর থালা প্রদত্ত হইল। এইরূপে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-বেশ সম্পূর্ণ হইলে ময়নামতী তাঁহাকে হাড়িফার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের যাবতীয় অনুষ্ঠান যথারীতি সমাচরিত হইলে গোপীচন্দ্র, কন্থা-কৌপীন-বর্হিবাসাদিসহ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। খেতুয়া তদ্দণ্ডেই অগ্রসর হইয়া গোপীচন্দ্রকে হাতী, ঘোড়া, দণ্ড, ছত্র প্রভৃতি ভিক্ষা-স্বরূপ দান করিল। গোপীচন্দ্র, তৎসমুদয় তদ্দণ্ডেই গুরুর চরণে নিবেদন করিয়া দিলেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—'তিন কোণ পৃথিবী টলিয়া গেলেও তোমার কখনও মৃত্যু হইবে না'। গোপীচন্দ্র স্বর্গের মুনি-ঋষি ও দেবতাগণের সমক্ষে অমরত্ব-বর লাভ করিলে, তাঁহারা স্ব স্ব ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সন্ন্যাসের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হইলে, ময়নামতী পাঁচ 'লোটা' জলে স্নান করিয়া আপনার 'মহলে' আগমন করিলেন

এবং তাড়াতাড়ি অন্ন ও পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন। তদনন্তর সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে সুবাসিত জল এবং সুবর্ণ-থালায় অন্ন ও পঞ্চাশ ব্যঞ্জন পরিবেষণ করিয়া গোপীচন্দ্রকে ভোজন করিতে আহ্বান করিলেন। গোপীচন্দ্র আগমন করিলে, ময়নামতী বলিলেন—'বৎস, দুলাল আমার, আমি স্বহস্তে এই অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়াছি—তুমি আহারান্তে হাসিয়া খেলিয়া যে দেশে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারিবে। গোপীচন্দ্র সুবর্ণ-থালায় অন্ন ও সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে সুবাসিত জল দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'আমি যখন রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলাম, তখন সুবর্ণ-থালায় অন্ন ভোজন করিয়াছি, সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে সুবাসিত জল পান করিয়াছি—এখন আর আমি এ সকল স্পর্শ করিবার অধিকারী নহি'! এই বলিয়া, একটি কদলীপত্রে অল্প-পরিমাণ অন্ন এবং করঙ্গ-তুম্বায় জল ঢালিয়া লইলেন। তৎপরে, হস্তমুখ প্রক্ষালনাদির পরে, 'শ্রীহরি' স্মরণ করিয়া এক গ্রাস, দুই গ্রাস—পঞ্চ গ্রাস ভোজন করিলেন। এই সময়ে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল পান করিবার অভিলাষে, 'করঙ্গ-তুম্বার' দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন—ভগ্ন তুম্বা দিয়া জল নির্গত হইয়া মৃত্তিকায় আশ্রয় লইয়াছে। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, গোপীচন্দ্র সেই মৃত্তিকার জল 'চুমুক' দিয়া পান করিলেন। এই অপরাধের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে শনি ও কেতু, গোপীচন্দ্রের দেহ আশ্রয় করিল!—

তখন হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব অঙ্গকান্তি মলিন হইবার ও শারীরিক যাবতীয় কষ্ট ভোগ করিবার সূত্রপাত হইল।

গোপীচন্দ্রের ভোজন সমাপ্ত হইলে, ময়নামতী তাঁহাকে বার কাহন কড়ি ভিক্ষা দিয়া করুণস্বরে উপদেশচ্ছলে বলিলেন—'বৎস, তুমি বিদেশে চলিলে—স্মরণ রাখিও, অতিথি বৈষ্ণব দেখিয়া কখনও অবহেলা করিও না—যাঁহার গলায় মালা দেখিবে, তাঁহাকে 'গড়' হইয়া প্রণাম করিবে। বিদেশে বাস করা অতি কঠিন—অগ্রে গৃহস্থগণ ভোজন করিয়া পশ্চাৎ অতিথির সংবাদ লয়; সুতরাং ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। আপনাকে সরিষা অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং দূর্ব্বা অপেক্ষাও নীচ জ্ঞান না করিলে, বিদেশে বাস করা কঠিন। বৃক্ষ হইতে ফুল পাড়িবে না—পক্ষীর প্রতি ঢিল নিক্ষেপ করিবে না। পর-স্ত্রী দেখিয়া হাস্য করিবে না—তাঁহাদিগকে অগ্রে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া, পশ্চাৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিও। আর এক কথা, আমি তোমার ঝুলিমধ্যে ভিক্ষা-স্বরূপ ষোল কাহন কড়ি রাখিয়া দিলাম,—ইহার কথা তুমি গুরুর নিকটে কদাপি ব্যক্ত করিবে না'।

সন্ন্যাসান্তে হাড়িফার আদেশমত গোপীচন্দ্র, ভিক্ষা করিবার ছলে রাণীগণের নিকটে বিদায়গ্রহণজন্য অন্তঃপুর-মধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাণীগণ, তরুণ রাজার সন্ন্যাস-বেশ দর্শন করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ববৎ, তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া দেশান্তরে গমন করিবার

অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গোপীচন্দ্র তাঁহাদিগকে কতরূপ আশ্বাস দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন—তাঁহারা কিছুতেই শূন্য গৃহে বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন না। পথে দস্যু-ভীতি, প্রভৃতি নানারূপ ভয়প্রদর্শন করিলেও তাঁহারা প্রবোধ মানিলেন না; পরন্তু, অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—স্বামীর সঙ্গে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি মৃত্যু হয়, সে ত শ্লাঘার কথা'। তীব্র-কোমল নানারূপ উপদেশ-বাক্য, কোনরূপ ফলপ্রদ হইল না। কিন্তু গোপীচন্দ্রের উপায়ান্তর নাই! তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'তোমরা খেতুয়ার আশ্রয়ে রহিয়া কোনরূপে কালক্ষেপণ কর—আমি দ্বাদশ বর্ষান্তে আবার আসিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া চিরসুখে কাল কাটাইব—তোমরা আমার সন্ন্যাসের অন্তরায় হইও না—আমি বিদায় হইলাম। তোমাদের সাহচর্য্যে আর অধিক কালক্ষেপণ করিবার আমার অধিকার নাই'।

গোপীচন্দ্র মহিষীগণকে স্বল্পাক্ষরে এবংবিধ কঠোর বাক্য বলিয়া অন্তঃপুর হইতে দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারা, আর বাক্যব্যয় বৃথা মনে করিয়া সকল ভবিষ্যৎ জ্বালাযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার মানসে, সকলেই ছুরিকাঘাতে গোপীচন্দ্রের সমক্ষে আত্মহত্যা করিলেন। কোন্ সময়ে কি ব্যাপার! গোপীচন্দ্র বড়ই বিভ্রত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর, প্রকৃতিস্থ হইয়া হাড়িফা গুরুকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি

তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মন্ত্র-পূত ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র, মহিষীবৃন্দ সকলেই চেতনা লাভ করিলেন!

এখন মহিষীগণ, হাড়িফার অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া, তাঁহার তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের স্বামীর দেশান্তরে গমন, বিশেষ আপত্তিজনক মনে করিলেন না। তাঁহারা মনকে প্রবোধ দিয়া ভাবিলেন,—যখন সত্য সত্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশান্তরে যাইতেই হইবে, তখন একক যাওয়া অপেক্ষা, এমন অলৌকিক ক্ষমতাশালী গুরুর তত্ত্বাবধানে প্রস্থান করাই তাঁহার পক্ষে শুভকর সন্দেহ নাই। তথাপি, রাজা গোপীচন্দ্র, অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র তাঁহারা ধূলায় পড়িয়া স্খলিত-বেশে আলুলায়িত-কেশে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।

রাজার অনুপস্থিতিকালে, খেতুয়া সিংহাসনে অধিরোহণ-পূর্ব্বক রাজপ্রতিনিধি-স্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। গোপীচন্দ্রের একশত রাণী খেতুয়া দেবরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা খেতুয়া গোলামের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্লেষসহকারে বলিতে লাগিলেন—'ছোটলোকের ছেলে বড় বিষয় প্রাপ্ত হইলে, টেরা করিয়া পাগড়ী বাঁধিয়া আপনার ছায়া নিরীক্ষণ করে।' কিন্তু ক্রমে তাঁহারা তাহার সদয় ব্যবহারে প্রীত হইয়া পরবর্ত্তী কালে স্বামি-শোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

অদুনা পদুনা ও অন্যান্য প্রধান মহিষীবৃন্দ কিন্তু, অন্তঃপুর ত্যাগ করিলেন না—তাঁহারা শোকার্ত্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অন্তঃপুরমধ্যেই বাস করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুর সুরক্ষিত করিবার জন্য, 'বার জায়গায় চৌকী ও তের জায়গায় থানা বসান' হইল। 'রামজাল' ও 'ব্রহ্মজালে' রাজপুরী পরিবেষ্টিত হইল—'দ্বাদশ বৎসরকাল আর কোন প্রাণী তাহা অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এমন কি, বৈষ্ণব অতিথি—যাঁহাদের সর্ব্বত্র অবাধ গতি—তাঁহারা পর্য্যন্ত, অন্তঃপুরের ত্রিসীমায় আগমন করিতে পারিবেন না। অদুনা পদুনা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, 'ধর্ম্মের কপাট' আপনা আপনি কুলুপ-বদ্ধ হইয়া গেল। অদুনা পদুনা আলুথালুভাবে 'সত্যের পাশা'-হস্তে শূন্যমনে বসিয়া রহিলেন—তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত বুঝিলেন—যেদিন এই পাশা তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবে, সেইদিন তাঁহারা স্বামি-হারা হইবেন।'

গোপীচন্দ্র, 'সত্যের অন্ন - সত্যের পাশা' এবং দ্বার-দেশে 'দামামা জোড়' রক্ষা করিয়া, হাড়িফার সহিত প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

'এই রাজার মুলুক ছাড়িয়া অন্ত মুলুক গেল।'

'আশীমণের কাঁথা রাজা লইলেন মাথে।
পশ্চাতে গোড়ায় রাজা বাউলের সাথে॥'

গৃহত্যাগ—পথে পথে

গোপীচন্দ্র, সন্ন্যাসান্তে স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হাড়িফার সহিত দেশান্তরে গমন করিতেছেন। অগ্রে হাড়িফা— পশ্চাতে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে হাড়িফার আশীমণ ভারী ভয়ঙ্কর কন্থা মস্তকে লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন।

কোন মত্ত হস্তীরও সাধ্য নাই যে, এই ভীষণ কন্থা নড়াইতে পারে! ইহাতে, নয়-কুড়ি বৎসর 'ক্ষার-পানি' পড়ে নাই—এখন ধৌত করিতে হইলে 'সাত দরিয়ার' জল এবং শুষ্ক করিতে হইলে চৈত্র-বৈশাখের অগ্নিবৎ প্রতপ্ত রৌদ্রের প্রয়োজন হইবে। কন্থার দুর্গন্ধ, ছয় মাসের পথের দূরস্থিত লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলে—ইহাতে কত মাকড়শার জাল, কত আরসোলার বাসা—কত ডালি ডালি উকুন!

গোপীচন্দ্র, তাঁহার গুরুর এই দুর্গন্ধময় বমনোদ্রেককারী অস্পৃশ্য কন্থা-স্তূপ মস্তকে বহন করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু হাড়িফা ইহাও যথেষ্ট মনে করিলেন না—তিনি মন্ত্রবলে এই কন্থার ভার বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। গোপীচন্দ্র রাজার সন্তান— স্বয়ং রাজা, চিরকাল বিলাস-ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছেন।

কখন সামান্যমাত্র পথও নগ্নপদে পদব্রজে গমন করেন নাই। এখন এই বিরাট্ কন্থা-স্তূপ মস্তকে লইয়া কঙ্কর ও কণ্টকময় পথে একক্রোশ, দুইক্রোশ—পঞ্চক্রোশ যাইতে না যাইতে তাঁহার কোমল চরণযুগল ফাটিয়া উহা হইতে রক্তস্রোত নির্গত হইতে লাগিল ! কিন্তু তথাপি গমনের বিরাম নাই—দিবানিশি অবিরাম সাতদিন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া, তাঁহারা অপর রাজার রাজ্যসীমায় প্রবেশ করিলেন।

গোপীচন্দ্র, ইতঃপূর্ব্বে হাড়িফাকে কত অবজ্ঞা করিয়াছেন—কত অপমানিত করিয়াছেন—তাঁহার কত নিন্দা কত গ্লানি করিয়াছেন। এখন তিনি সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে, তাঁহার কৃতকর্ম্মের প্রতিফলস্বরূপ অশেষ দুঃখ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। গোপীচন্দ্র, ধীরভাবে অবনত-মস্তকে তৎসমুদয় সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পরিষ্কৃত প্রান্তরমধ্যে যাইতে যাইতে হাড়িফা, 'তুড়্-তুড়্' শব্দ করিয়া এক সুবিস্তীর্ণ গহন অরণ্যের সৃষ্টি করিলেন। গুল্মকণ্টকাকীর্ণ পথচিহ্নবিহীন ভীষণ অরণ্য—বনস্পতি ও ক্ষুদ্রবৃহৎ তরুরাজির ইতস্ততঃ-প্রসারিত শাখানিচয় দুর্ভেদ্য জাল সৃষ্টি করিয়া প্রতিপদেই অগ্রগমনে বাধা প্রদান করিতেছে ! কি সূচীভেদ্য অন্ধকার—দিবারাত্রের ভেদাভেদ নাই—অংশুমালীর সর্ব্বব্যাপী কিরণজাল এই অরণ্যের মধ্যে কখনও প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই ! গোপীচন্দ্র, এই নিবিড়-তমসাচ্ছন্ন দুর্গম অরণ্যের মধ্যে কণ্টকগুল্ম বিদলিত করিয়া,

গতিরোধকারী প্রসারিত শাখানিচয় হস্ত-সঞ্চালনে উন্মুক্ত ও দ্বিধাভিন্ন করিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন—আর হাড়িফা গুরু, তাঁহার মস্তকোপরি শূন্যপথে উড়িয়া চলিতেছেন। এই ভাবে, হাড়িফার মায়া-সৃষ্ট ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য জঙ্গল অতিক্রম করিতে করিতে গোপীচন্দ্র একবারে ক্ষতবিক্ষত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন—সর্ব্বাঙ্গই রক্তধারায় রঞ্জিত হইয়া গেল, কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল— মুখে বাক্য নির্গত হয় না। তখন তিনি আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না—কপালে করাঘাত করিয়া ঘনান্ধকার অরণ্যমধ্যে বসিয়া পড়িলেন এবং বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

গোপীচন্দ্র, এই কয়দিন অন্ধকারে অতিবাহিত করিয়া সূর্য্য-কিরণের মৃদুমধুর সুখস্পর্শ লাভের জন্য মনে মনে লালায়িত হইলেন। হাড়িফা, তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া মায়াপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সেই ভীষণ অরণ্য শূন্যে বিলুপ্ত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দিগন্ত-প্রসারী বালুকাময় প্রদেশ সৃষ্টি করিলেন এবং ব্রহ্মা ও সূর্য্যদেবকে এই বালুকাময় প্রদেশ উত্তপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহারা তদ্দণ্ডেই ত্রয়োদশ আদিত্যের প্রচণ্ড তেজ প্রকটিত করিয়া সেই নবসৃষ্ট বালুকাপ্রদেশ অগ্নিকুণ্ডসদৃশ করিয়া তুলিলেন। গোপীচন্দ্রের মনোগত আকাঙ্ক্ষা যে, অচিরেই এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইবে, তাহা তিনি আদৌ কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি এখন সূর্য্যের অনলবর্ষী প্রখর কিরণে এবং

জলন্ত-অগ্নিসদৃশ দিগন্তবিস্তৃত বালুকা-ক্ষেত্রমধ্যে ছুট্ ফট্ করিতে লাগিলেন—প্রচণ্ড উত্তাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। তখন তিনি গুরুর নিকটে একটি ছায়াশীতল বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিবার সানুনয় প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

গোপীচন্দ্রের দুরবস্থা দর্শন ও কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, হাড়িফার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল—তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুরোভাগে একটি 'কেলি-কদম্ব' বৃক্ষের সৃষ্টি করিলেন। রৌদ্রদগ্ধ গোপীচন্দ্র, শীতলছায়াসমন্বিত কেলি-কদম্বের বৃক্ষ দেখিবামাত্র গুরুকে পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুতপদে তদভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন—হাড়িফার অনুমতি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন না। ফলে, নূতন প্রহেলিকার অভিনয় আরব্ধ হইল—গোপীচন্দ্র যতই অগ্রসর হন, বৃক্ষটিও ততই অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অবশেষে শাখা-প্রশাখাসমেত ভূমিসাৎ হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। গোপীচন্দ্র বহুক্ষণ বৃক্ষাভিমুখে ধাবিত হইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—এক্ষণ অনন্যোপায় হইয়া যথাপূর্ব্ব ক্রন্দন করিতে লাগিলেন!

হাড়িফার হৃদয়ে পুনরায় দয়ার সঞ্চার হইল—তিনি পুনরায় অপর এক বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া গোপীচন্দ্রসহ তাহার শীতল ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। গোপীচন্দ্র অতিমাত্রায় ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়াছিলেন—এখন শীতল ছায়ার আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়ায় গভীর নিদ্রায় তাহার চক্ষুযুগল মুদ্রিত হইয়া

আসিল! আবশ্যক বুঝিয়া হাড়িফা, তাঁহার বাম জানু উপাধানস্বরূপ ব্যবহার করিবার জন্য অগ্রসর করিয়া দিলেন —গোপীচন্দ্র তাহাতে মস্তক রক্ষা করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। হাড়িফার আদেশমত, যম-জননী মস্তকে পর্য্যঙ্ক ও হস্তে বৃন্ত লইয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। নিদ্রিত গোপীচন্দ্রকে ঐ পর্য্যঙ্কে স্থাপিত করিয়া যম-জননী তালবৃন্তব্যজনে তাঁহার সুখনিদ্রাভোগের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোপীচন্দ্র নিদ্রিত হইলে,হাড়িফা,তাঁহার পদব্রজে গমনের সুবিধার জন্য, দরিয়াপুর সহর পর্য্যন্ত এক 'জাঙ্গাল' প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায় করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে অরণ্যাদি পরিষ্কৃত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তদ্দণ্ডেই আদেশ প্রতিপালন করিলে, হাড়িফা 'তুড়্ তুড়্' শব্দে হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন। তাঁহার হুঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র, স্বর্ণ-টুপি মস্তকে দিয়া বালক-যম, রসের কাঠি গলায় দিয়া যুবক-যম, এবং সুবর্ণ-যষ্টি হস্তে বৃদ্ধ-যম দলে দলে সজ্জিত হইয়া তাঁহার চরণ-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাড়িফা, তাহাদিগকে দরিয়াপুর সহর পর্য্যন্ত 'সাতহাত প্রস্থ' ও 'এক বুক উচ্চ' এক 'জাঙ্গাল' বা শরণি প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

যমদূতগণ এই শরণি-নির্ম্মাণকার্য্যে আপন আপন কর্ম্ম বিভক্ত করিয়া লইল। যুবক-যম 'চাপা' কাটিতে, বালক-যম

তৎসমুদয় বহন করিতে এবং বৃদ্ধ-যম তৎসমুদয় যথাবিন্যস্ত করিতে নিযুক্ত হইল। তাহাদের ক্ষিপ্রকারিতাগুণে ও হাড়িফার আদেশের প্রভাবে ছয় মাসের কাজ ছয় দণ্ডে সুসম্পন্ন হইল। দরিয়াপুর সহর পর্য্যন্ত সুবৃহৎ শরণি প্রস্তুত হইলে, যমদূতগণ নিষ্কৃতি পাইল। শরণি প্রস্তুত হইলে কচ্ছপ, তাহার উপর ভ্রমণ করিয়া সদ্যঃপ্রক্ষিপ্ত মৃত্তিকা সংহত ও দৃঢ় করিয়া দিল। হাড়িনী গাত্রস্থ মলা-ধূলা আকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা রাস্তা লেপিয়া মসৃণ করিল এবং মালিনী আসিয়া চন্দনাদিদ্রব্য-বর্ষণে সমগ্র শরণি সুবাসিত করিয়া তুলিল।

এই সুবৃহৎ শরণি প্রস্তুত ও পরিষ্কৃত হইলে, হাড়িফা তাহা সুখশীতল-ছায়াযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় তুড়্ তুড়্ শব্দে হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কা হইতে অসংখ্য অনুচর সহ হনুমান্ আসিয়া তাঁহার চরণতলে প্রণাম করিলেন। হাড়িফার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা নবরচিত পথের উভয় পার্শ্বে নানারূপ সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিল এবং সুন্দর সুন্দর প্রস্তর আনিয়া পথিপার্শ্বস্থ দীঘির ঘাট বাঁধিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে মনোহর পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়া দিল। হনুমান্ ও তাহার অনুচরগণ চিরকাল একমাত্র রামচন্দ্রের দাস—কিন্তু তাহাদেরও প্রতি হাড়িফার এই অত্যাচারে তাহারা মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রতিফল দিবার মানসে নিদ্রিত হাড়িফার হস্তে 'রাম-রথের ডোর' বাঁধিয়া তাহাকে টানিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া ত দূরের কথা, তাঁহার হস্তখানি পর্য্যন্ত তাহারা তুলিতে বা নড়াইতে সমর্থ হইল না। হনুমান্ তখন অপ্রস্তুত হইয়া অগত্যা হাড়িফার পদে প্রণতিপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হাড়িফা, তাহাকে সদলবলে, 'মুখ-পোড়া বানর' হইবার অভিসম্পাত প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি দিলেন।

গোপীচন্দ্রের পথশ্রমলাঘবের জন্য হাড়িফা এত আয়াস ও যত্ন করিয়া অত্যল্পকালমধ্যেই এমন সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য শরণি প্রস্তুত করিয়া ভাবিলেন—গোপীচন্দ্রকে এই পথ দিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে একবার তাহার মন পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। এই নিমিত্ত তিনি সুখ-শয্যায় নিদ্রিত গোপীচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে এক 'বজ্র-চাপড়' মারিলেন। গোপীচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় অকস্মাৎ ভীষণরূপে প্রহৃত হইয়া 'মা-মা' পরিবর্ত্তে 'গুরু-গুরু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হাড়িফা, ইহা হইতেই বুঝিতে পারিলেন, গোপীচন্দ্র তাঁহার প্রতি কিরূপ অনুরক্ত হইয়া, সংসারের সর্ব্ববিধ মায়ার বন্ধন উন্মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং, এই কুসুম-সুবাসিত ও ছায়াসমন্বিত নবরচিত শরণি দিয়া গোপীচন্দ্রকে লইয়া যাইতে অসম্মত হইলেন না।

চির ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত গোপীচন্দ্র, হাড়িফার সহিত সেই কুসুম-চন্দন-সুবাসিত, মনোহরপুষ্পাস্তীর্ণ ও সুশীতল ছায়াসমন্বিত নবরচিত শরণির উপর পদব্রজে যাইতে যাইতে

তাঁহার সংযত মন চঞ্চল হইল। তাঁহার মনে হইল, এবং গুরুসমীপে তাহা প্রকাশিত করিয়া বলিলেন—'যদি প্রত্যাগমনকালে আপনি এই পথ দিয়া পুনরাগমন করেন, তাহা হইলে,আমি এই সুদুর্লভ মনোহর পুষ্প প্রিয়তমা মহিষীগণকে উপহার দিবার জন্য লইয়া যাইবার অভিলাষ করিতেছি'। সন্ন্যাস-ব্রতধারী গোপীচন্দ্রের এবংবিধ প্রগল্‌ভ বাক্যে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া হাড়িফা, তাঁহার ধৃষ্টতার সমুচিত দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

নবনির্ম্মিত পথে গমন করিতে করিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া হাড়িফা আপনার অভিপ্রেত-সাধনোদ্দেশে গোপীচন্দ্রকে বলিলেন—'আমি তোমার ভ্রমণের সুবিধার জন্য এই সুবৃহৎ সুন্দর শরণি প্রস্তুত করাইতে বিশেষরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি—তুমি আমায় বার-কড়া কড়ি দাও—আমি গঞ্জিকা সেবন করিয়া অবসন্ন দেহে বলসঞ্চয়পূর্ব্বক ও স্ফূর্ত্তি সাধন করি।' গঞ্জিকা সেবনের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মী রাজা গোপীচন্দ্র কর্ণমূলে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক 'রাম-রাম' উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—'গুরো, আপনি গঞ্জিকা সেবন করেন? ছিঃ! আপনি এরূপ অনাচারী জানিলে, কে আপনার সঙ্গে আসিত? অনাচারীর সহিত পথ-ভ্রমণ করিতে হইলে মরণ মঙ্গল হয়। আপনি বার-কড়া কড়ি চাহিতেছেন,—আমি বার কড়ার পরিবর্ত্তে বার-কাহন দিতেছি, গ্রহণ করুন—আপনাকে আর

পথ-নির্ম্মাণে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না—আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করুন।'

হাড়িফা এতক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন। গোপীচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং ধ্যান-নেত্রে তাঁহার ঝুলির মধ্যে ষোল-কাহন কড়ির সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইঁহার জননী ময়নামতী জ্ঞান-বৃদ্ধা—তিনিই ইঁহাকে ষোল-কাহন কড়ি প্রদান করিয়াছেন। হাড়িফা তখন 'তুড়্-তুড়্' শব্দে হুঙ্কার ছাড়িবামাত্র ময়নামতী-প্রদত্ত ষোল-কাহন কড়ি শূন্যে উড়িয়া গেল এবং তৎপরিবর্ত্তে অর্দ্ধমণ করিয়া দুইটি প্রস্তর তাঁহার ঝোলার মধ্যে সৃষ্টি করিয়া রাখিলেন। ঝোলার ভার পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান রহিল। ঝোলা হইতে কড়ির অন্তর্ধান এবং তৎপরিবর্ত্তে গুরুকর্ত্তৃক তথায় অর্দ্ধমণী দুইটি প্রস্তর সংস্থাপন—গোপীচন্দ্র ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না!

গঞ্জিকা-সেবনের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে, গঞ্জিকা-সেবিগণ যেমন হাই তুলিয়া, গাত্র-'মোটন' করিয়া কাসিয়া কাসিয়া গঞ্জিকা-সেবনের প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞাপিত করে, হাড়িফা তদ্রূপ ভাণ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

'ঝোলার গিরা খুলিয়া পড়িয়া গেল ধান্দা।
ঝোলার কড়ি ঝোলার নাই আচম্বিতের কথা॥'
'উপরে আছে গিরো গাইট তলত নাই যে ভাঙ্গা।
ঝুলির কড়ি ঝুলিতে নাই গুরুবাপ্ মোক থুইয়া খা বান্ধা॥'

গোপীচন্দ্রকে বন্ধক দান—হাড়িফার অন্তর্ধান

গঞ্জিকা-সেবনের ব্যয়, বার-কড়া কড়ির জন্য হাড়িফা, গোপীচন্দ্রকে বিষম উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। গোপীচন্দ্র, হাড়িফার এই অপকর্ম্মের প্রশ্রয় দান করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অগত্যা মনে মনে ক্রোধযুক্ত হইয়া, বার-কড়া কড়ি বাহির করিবার জন্য ঝোলার 'গিরা' খুলিয়া ফেলিলেন।

ঝোলার গিরা খুলিয়া গোপীচন্দ্র বিষম ধাঁধায় পড়িলেন। জননীর আদেশে তিনি কত গোপনে, কত যত্নে, কত সন্তর্পণে ষোল-কাহন কড়ি, তাঁহার ঝোলার মধ্যে 'গিরা-গাইট' দিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ কি?—ষোল-কাহন কড়ির পরিবর্ত্তে তৎসম ওজনের তুইটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড! এ আবার কি প্রহেলিকা! তিনি একবারে নির্ব্বাক্ ও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কিন্তু, ক্ষণ পরে তিনি হাড়িফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'ঝোলার ঊর্দ্ধাংশ যথারীতি গাঁইট-বন্ধনে আবদ্ধ—নিম্নাংশও ছিন্ন নহে—তথাপি ঝোলার কড়ি ঝোলায়

নাই—এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা ! এখন, আমার প্রতি-শ্রুতিমত আপনার জন্য কড়ি কোথায় পাইব ? আপনি এক কাজ করুন—আপনি আমায় কোথাও বন্ধক দিয়া আপনার প্রয়োজনীয় কড়ি গ্রহণ করুন।' এই কথা শুনিবামাত্র হাড়িফা তৎক্ষণাৎ বসুমতীকে লক্ষ্য করিয়া সাক্ষ্য মান্য করিয়া বলিলেন—'মা বসুমতি, আপনি সাক্ষী রহিলেন—গোপীচন্দ্র স্বেচ্ছায় নিজকে বন্ধক দিতেছেন।' তদনন্তর হাড়িফা, ধর্ম্মী রাজা গোপীচন্দ্রকে ঝোলায় ভরিয়া দরিয়াপুর সহরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হাড়িফা তথায় এক গোপীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'গোয়ালিনী মাই, গঞ্জিকা-সেবনজন্য আমার বার-কড়া কড়ি আবশ্যক। আমার নিকটে একজন চেলা আছে—ইহাকে বন্ধক রাখিয়া আমায় বার কড়া কড়ি দিতে পার ?' এই কথা শুনিয়া গোপগৃহিণী, তাঁহার চেলাকে দেখিতে চাহিলে, তিনি ঝোলা হইতে গোপীচন্দ্রকে হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলেন—গোপীচন্দ্র অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে ঝল্‌মল্ করিয়া গোপ-প্রাঙ্গণ আলোকিত করিয়া দিলেন। গোপীচন্দ্রকে দেখিবামাত্র গোপ-গৃহিণী বলিল—'আপনার চেলা পরম সুন্দর ও রূপবান্—তদুপরি, গোপ-গৃহে তাঁহার অন্নগ্রহণ চলিবে না। আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন—আমার গৃহে হইবে না'।

হাড়িফা তখন গোপীচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া অন্যত্র

বাজারমধ্যে চলিয়া গেলেন। তথায় এক চিপিটক-বিক্রেত্রীর নিকটে গিয়া বলিলেন—'চিড়া-বেচী মাই, আমার এই চেলাকে বন্ধক রাখিয়া, আমায় বার-কড়া কড়ি দিতে পার ?' 'চিড়া-বেচী মাই,' গোপীচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহার দোকানের যাবতীয় দ্রব্যাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। এইরূপে 'হলদি-বেচা মাই,' 'শাক-বেচী মাই', 'লবণ-বেচা মাই' প্রভৃতি যাহার নিকটে উপস্থিত হইল—সকলেই গোপীচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহারা সকলেই বলিল—'থালা ভরিয়া তঙ্কা দিতেছি—ঝোলা ভরিয়া লইয়া যাও—বান্ধাছান্দার কর্ম্ম নহে, আমার নিকটে একবারে বিক্রয় কর।' হাড়িফা সম্মত হইলেন না—'কলাই-বেচী'র দোকানে আসিলে সকলেই সমবেত হইয়া গোপীচন্দ্রের কোমর ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল—সকলেই বলিতে লাগিল, সে অগ্রে দেখিয়াছে, এবং ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছে—'কলাই-বেচী' পাইবে কেন ? এইরূপ ঘোরতর জটলা ও টানাটানির মধ্যে পতিত হইয়া গোপীচন্দ্রের ছিন্নভিন্ন হইবার উপক্রম হইল। তখন তিনি করুণস্বরে ক্রন্দন করিয়া হাড়িফার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

গোপীচন্দ্রের দুর্গতি দেখিয়া এবং তাঁহার কাতর ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া হাড়িফার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি হুঙ্কার ত্যাগ করিবামাত্র ইন্দ্রদেব আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে সেই দোকানের সম্মুখে ঘটনাস্থলে প্রচণ্ড ঝটিকা

প্রবাহিত করিতে এবং বিপুল জল ও শিলাবর্ষণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ইন্দ্রদেব আদেশ পাইবামাত্র, তাহা পালন করিলেন। তখন 'শাক-বেচী', 'লবণ-বেচী', 'হলদি-বেচী,' চিড়া-বেচী' সকলেই গোপীচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু 'কলাই-বেচী' তাহার মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, তাহার কটিদেশে বাহুবেষ্টনপূর্ব্বক ধরিয়া আছে। দেবরাজ, হাড়িফার অভিপ্রায়মত, তাহার পৃষ্টদেশে প্রকাণ্ড শিলা নিপাতিত করিয়া তাঁহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলেন—তখন সে কুব্জা হইয়া গোপীচন্দ্রের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিল।

হাড়িফা সেই স্থান হইতে এক মোদকের দোকানে আসিয়া গোপীচন্দ্রকে বন্ধক রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। মোদক, চেলার রূপ দেখিয়া বলিল—'আপনার চেলার যেমন রূপ, দেবতারও এমন রূপ হয় না। আহা, ইহার দেহ কি দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে! রূপ ত নয়—যেন অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে! এমন রূপ লইয়া কি আপনার এই চেলা, আমাদের 'চাষা লোকের' ঘরে খাটিয়া খাইতে পারিবে? তবে ইহার উপযুক্ত একটি স্থান আছে—সে হীরা-নটীর বাড়ী। কিন্তু, তাহার গৃহে প্রবেশ করা সহজ কর্ম্ম নহে। তাহার বহির্দ্বারে জোড়া দামামা বিলম্বিত আছে—কোন রাজা মহারাজ বা বড়লোক আসিলে, ঐ দামামায় আঘাত করিয়া আগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন। দামামায় যত ঘা'

দিবে, তত সহস্র তঙ্কা দরজায় গণিয়া দিলে, তবে তাহার 'মহলে' প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। যে তঙ্কা দিতে অসমর্থ হইবে, তাহাকে তাহার ভৃত্যগণ গলহস্ত দিয়া দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। হীরা-নটী রাণীবিশেষ—দেখুন, সেখানে গেলে আপনার বন্ধক রাখিবার সুবিধা হইতে পারে।'

হাড়িফা, মোদককে এই সংবাদ-জ্ঞাপনের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া গোপীচন্দ্র সহ হীরা-নটীর বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশে জোড়া দামামা ও লগুড় বিলম্বিত রহিয়াছে—হাড়িফা তথায় উপস্থিত হইয়া দামামায় ক্রমাগত প্রচণ্ড জোরে লগুড়াঘাত করিতে লাগিলেন। দামামার প্রচণ্ড শব্দে হীরার সমগ্র পুরী ভূমিকম্পের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। এক ঘা' মারিলে সহস্র মুদ্রা দিতে হয়—কে এমনভাবে ক্রমাগত ঘা' মারিয়া স্রোতের মত অজস্র মুদ্রা ঢালিয়া দিবার জন্য আগমন করিয়াছেন? দ্বাররক্ষকগণ, এই জন্য সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া সাগ্রহ-নেত্রে দামামায় আঘাতকারী ব্যক্তির উদ্দেশে ছুটিয়া আসিল।

হীরা-নটী, ক্রমাগত দামামা আঘাতের দীর্ঘকালব্যাপী শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রচুর অর্থাগমের আশায় বান্দীকে আদেশ দিলেন—'দ্বারদেশে কোন মহারাজ আসিয়া থাকিবেন—সত্বর চামরব্যজন করিতে করিতে তাঁহাকে লইয়া আইস।' বান্দী আদেশ পাইবামাত্র দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দেখিল—

একজন বৈরাগী সন্ন্যাসী আসিয়া এইরূপ গোলযোগ বাঁধাইয়াছে ! সে দেখিল—বৈরাগী সন্ন্যাসীর চক্ষুর্দ্বয় যেন স্বর্গের তারার ন্যায় উজ্জ্বল—দন্তপংক্তি মাঘ মাসের মূলার ন্যায় শুভ্র ! হাড়িসিদ্ধা বান্দীকে দেখিয়া বলিলেন যে, তিনি হীরা-নটীর রূপজ মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহার দ্বারস্থ হন নাই—তাহার নিকটে তিনি অপর কোন অনুগ্রহের প্রার্থীও নহেন। তিনি, তাঁহার চেলাকে বন্ধক রাখিয়া গঞ্জিকা সেবন জন্য বার-কড়া কড়িমাত্র চাহেন—অপর কিছু নহে। এই বলিয়া তিনি ঝোলার ভিতর হইতে গোপীচন্দ্রকে টানিয়া বাহির করিলেন। গোপীচন্দ্রের রূপে চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বান্দী, গোপীচন্দ্রের অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী দর্শনে কিছুক্ষণ ব্যাস্তবদনে দণ্ডায়মানা রহিয়া হীরার নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল—'দ্বারদেশে এক বৈরাগী সন্ন্যাসী তাঁহার এক শিষ্যকে বন্ধক রাখিয়া আপনার নিকটে বার-কড়া কড়িমাত্র প্রার্থনা করিতেছে। ওঃ ! তাহার সেই তরুণ শিষ্যের কি ভুবনোজ্জ্বলকারী রূপ ! প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, তাহার চরণে যে রূপ আছে—আপনার বদনমণ্ডলে তেমন রূপ নাই ! আপনি যে রাজার শুভাগমনের জন্য দ্বাদশবর্ষ কাল তপস্যা করিতেছিলেন, সেই রাজাই আজ আপনার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত' ! বান্দীর এই কথা শ্রবণ করিয়া হীরা আহ্লাদসাগরে নিমগ্না হইলেন।

দাসীমুখে গোপীচন্দ্রের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া হীরা স্থির থাকিতে পারিল না। সে বিবিধ সাজে সুসজ্জিত হইয়া হেলিয়া দুলিয়া নূপুরধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতে করিতে দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। হীরা-নটী অপূর্ব্বরূপসী—তাহার রূপের কি তুলনা হয়?—মনুষ্য কোন্ ছার, দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাহার রূপে বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

হাড়িফা, হীরা-নটীকে দেখিয়া গোপীচন্দ্রকে বার-কড়া কড়ির পরিবর্ত্তে বন্ধক দিবার প্রস্তাব করিলেন। হীরা তথায় উপস্থিত হইয়া গোপীচন্দ্রকে দেখিবামাত্র একবারে বিমোহিত হইয়া গেল। দাসী যে তাহাকে একবর্ণও অতিরঞ্জিত করিয়া বলে নাই—এ কথা সে এখন বেশ বুঝিতে পারিল। এই নিমিত্ত, সে গোপীচন্দ্রকে চিরতরে লাভের আশায় বলিল—'বন্ধক কেন, তোমার শিষ্যকে যে কোন মূল্য দিয়া একবারে ক্রয় করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি'। হাড়িফা কিন্তু তাহাতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা হীরা, বার-কড়া কড়ি দিয়া আপাততঃ বার বৎসরের জন্য গোপীচন্দ্রকে বন্ধক রাখিতেই স্বীকৃত হইল।

গোপীচন্দ্রকে বন্ধক রাখিবার দলিল লেখাপড়া করিবার জন্য বন্দরের (কলিঙ্গ বন্দরের?) প্রধান সাধু আহূত হইলেন। তাঁহার সমক্ষে গোপীচন্দ্র স্বহস্তে দলিল লিখিয়া দিলেন। অপর তিন জন সাধু সাক্ষী হইলে, হীরা-নটী বার-

কড়া কড়ি গণিয়া দিয়া দলিলে স্বাক্ষর করিল। বার কড়া কড়ি প্রাপ্ত হইয়া হাড়িফা গোপীচন্দ্রকে হীরার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর হাড়িফাও 'রাম-রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ঐ কাগজে স্বাক্ষর করিলেন। আদান-প্রদান ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে, হীরার আনন্দ যেন উথলিয়া পড়িতে লাগিল!

গোপীচন্দ্রকে নটীর হস্তে সমর্পণ করিয়াই হাড়ি সিদ্ধা, সকলের অজ্ঞাতসারে নিমেষমধ্যে, তাঁহার কাম,ক্রোধ ও মায়া রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নপুংসকরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন? হীরা-নটী মুখ ফিরাইলে হাড়িফা, সেই সুযোগে সেই বার-কড়া কড়ি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, গোপীচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে অন্যত্র নেত্রসঞ্চালন করিলে, হাড়িফা 'সোনালো কুমড়ার' রূপ ধারণ করিয়া পাতালে প্রবেশপূর্ব্বক চৌদ্দ তাল জলের ভিতর দ্বাদশ বর্ষ জন্য যোগাসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ হাড়িফার অন্তর্ধানে গোপীচন্দ্র আপনাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় জ্ঞান করিয়া কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

'নটীর পরিধান হৈল আগুন পাটের সাড়ী।
ধর্ম্মী রাজার পরিধান হৈল বার গাঁঠিয়া ধড়ী'॥
'আকাড়ি ধানের চাউল দিলে বিচিয়া বার্ত্তকি।
মাঘ মাসিয়া জাড়ে দিলা বুড়া একখান সাড়ি'॥

হীরা-নটীর গৃহে গোপীচন্দ্র

হীরা-নটী, তরুণ যোগী গোপীচন্দ্রের অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে অতিমাত্রায় মুগ্ধ হইল এবং তাঁহাকে সুবাসিত জলে, 'তৈলে-খৈলে' স্নান করাইয়া স্বর্ণপর্য্যঙ্কের উপর 'আশগাড়ু' 'পাশগাড়ু' দিয়া এক-বুক-উচ্চ সুকোমল দুগ্ধফেননিভ সুবাসিত অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করাইল। তদনন্তর, সে 'শতেশ্বরী হার' ও নানারূপ দিব্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যে চর্চ্চিত হইয়া, গোপীচন্দ্রের পর্য্যঙ্কপার্শ্বে উপনীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য আসিয়া তাহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিল—দাসী ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। হীরা, রাজা গোপীচন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে নানারূপ আদর-যত্ন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া তাহার পাপ-কর্ম্মের সহচর হইবার জন্য অশেষপ্রকারে সানুনয় অনুরোধ ও প্রার্থনা করিল।

গোপীচন্দ্র, এতক্ষণ করচালিত পুত্তলিবৎ নির্ব্বাক্ ও নিষ্ক্রিয় রহিলেও তাঁহার জননীর উপদেশাবলী বিস্মৃত হন নাই। পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করিবে—কদাচ পরস্ত্রীর

মুখাবলোকন করিবে না—পরস্ত্রী দেখিয়া হাস্য-পরিহাস করিবে না—ইত্যাদি অমূল্য উপদেশনিচয়, তিনি সন্ন্যাস-জীবনে জপমালাস্বরূপ নিয়তই স্মরণ করিতেন। মাতৃ নির্দ্দিষ্ট পন্থা হইতে যাহাতে তিনি কেশ-পরিমাণও স্খলিত না হন, তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক রহিতেন। সুতরাং, তিনি হীরা-নটীর প্রলোভন ও পাপ-প্রস্তাব, তাহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া, অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন।

গোপীচন্দ্রকে দেখিয়া হীরা-নটীর হৃদয়ে যে মোহের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল—যে আশার অঙ্কুর হইয়াছিল, তাহা সঙ্গে সঙ্গেই, নির্ম্মম আঘাতে বিনষ্ট হইয়া গেল! আশাবৃতা নটী, পদস্পৃষ্টা ফণিনীর ন্যায় ক্রোধোদ্দীপ্তা হইয়া উঠিল। যাহার কৃপাকণার জন্য, কত কত মহারাজ দ্বারদেশে প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান, যাহার ইঙ্গিতমত অভিলষিত কর্ম্ম করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, তাহারা আপনাদিগকে ধন্য ও চরিতার্থ জ্ঞান করে,—তাহারই সানুনয় প্রার্থনা ও প্রস্তাব, একজন সামান্য যোগিশিষ্য কর্ত্তৃক, সাদরে গৃহীত হইবার পরিবর্ত্তে, এরূপ নির্ম্মমভাবে অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যাত হইবে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। হীরা-নটী গোপীচন্দ্রের ব্যবহারে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিয়া গোপীচন্দ্রের নির্ম্মম প্রত্যাখ্যানের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল।

হীরা-নটী, ইতঃপূর্ব্বে গোপীচন্দ্রকে যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক 'এক্ক-বুক-উচ্চ' শয্যাবিশিষ্ট পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া, লবঙ্গ-জায়ফল-কর্পূর-পূরিত তাম্বূল উপহার প্রদান করিয়া কত আদর, কত যত্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল—এখন, তাহার নির্ম্মম প্রত্যাখ্যানে অতিশয় ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইয়া, তাঁহাকে পর্য্যঙ্ক হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার সম্মুখ হইতে 'বান্দী' দ্বারা গলহস্ত প্রদানে বহিষ্কৃত করিয়া দিল!

এখন হইতে গোপীচন্দ্রের দুঃখের অবধি রহিল না—নানারূপ অকথ্য নির্য্যাতনে তাহাকে একবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। হীরা-নটী স্বয়ং বহুমূল্যবান্ 'আগুন পাটের' সাড়ী পরিধান করিত; কিন্তু গোপীচন্দ্রের জন্য জীর্ণ ও পুরাতন 'বারগাইট'-যুক্ত 'ধড়ী' বা শিশুগণের পরিধেয় ক্ষুদ্র বস্ত্রের ব্যবস্থা হইল। মাঘ মাসের 'হাড়-ভাঙ্গা' শীত নিবারণ জন্য, একটি সামান্য পুরাতন শতচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম বস্ত্রমাত্র প্রদত্ত হইল। দিনান্তে একবারমাত্র আহারের জন্য আছাটা চাউল ও বীজপূর্ণ বার্ত্তাকুর ব্যবস্থা করিয়া দিল—বার্ত্তাকু দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিবে, কিন্তু তৈল বা লবণ কণামাত্র প্রাপ্ত হইবে না!—এইরূপ মাত্রায় তাঁহার জন্য দৈনিক 'সিদা'র ব্যবস্থা হইল। ছাগ-শালায় গোপীচন্দ্রের শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল—অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দারুণ শীতে নগ্নপ্রায় দেহে ছাগশালায় অবস্থান করিয়া তাঁহার শরীর হরিদ্রাবর্ণ হইয়া গেল। গাত্রে এত 'মলা' সঞ্চিত হইল যে, কুদাল

দ্বারা চাঁছিয়া লইলে ‘একপাট দেওয়াল’ প্রস্তুত হয়! মস্তকের কেশরাশি তৈল ও প্রসাধনের অভাবে জটাবদ্ধ হইয়া ‘বেচু’-পক্ষীর আশ্রয়রূপে পরিণত হইল।

হীরার আদেশে, গোপীচন্দ্র ‘বার-কড়ার গোলাম’ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। সুবৃহৎ কলসী-সংযুক্ত সিকা-বাঁক সহযোগে প্রত্যহ করতোয়া নদী হইতে চৌদ্দভার জল আনয়ন, এই ‘বার কড়ার গোলাম’ রাজা গোপীচন্দ্রের নিত্য-কর্ত্তব্য হইল। সাত-ভার জল—চাঁপা, বকুল, কাঞ্চন, জাতী, যূথী, পারিজাত ও নাগেশ্বর এই সাতটি পুষ্পবৃক্ষে সেচন করিবে—অপর সাত-ভার জলে হীরা-নটী স্নান করিবে। অবসন্ন ও দুর্ব্বল দেহে অসামর্থ্যহেতু জলের পরিমাণ কোন দিন এক ভার কম হইলে, তাঁহাকে তৎ-পরিবর্ত্তে সাত প্রহরীর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করিতে হইত! হীরা-নটী গোপীচন্দ্রকে চিৎ করিয়া, তাঁহার উপর সুবর্ণের খড়ম পায়ে দিয়া তাঁহাকে দলিত ও মর্দ্দিত করিয়া সগর্ব্বে হাটিয়া বেড়াইত—তৎপরে তাঁহার উপর উপবেশনপূর্ব্বক অপর সাত-ভার জলে স্নান করিয়া তাঁহার মুখে সিক্ত বস্ত্র খানি নিপীড়িত করিয়া, বস্ত্রের জল উদরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিত।

এতদ্ব্যতীত, গোপীচন্দ্র, হীরা-গণিকার পাপ-শয্যা মার্জ্জন ও উত্তোলন এবং অন্যান্য নানাবিধ অকথ্য, ঘৃণিত ও নীচজনোচিত কর্ম্ম করিতে আদিষ্ট হইল। সমস্ত দিন এই-

রূপ পরিশ্রম করিয়াও, রাত্রিতে অবসর নাই—সমগ্র রাত্রিতে জাগ্রৎ রহিয়া হীরার শয্যা-গৃহের অদূরে চৌকী দিতে হইবে।

গোপীচন্দ্র, হীরা-নটীর এবংবিধ নানারূপ অমানুষিক অত্যাচারে মৃতকল্প হইয়া শীর্ণদেহে অতি কষ্টেই দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কষ্টের এত যন্ত্রণার দিনও যায়! এক দিন, দুই দিন—এক বৎসর, দুই বৎসর করিয়া দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল।

রাজা গোপীচন্দ্র এতদিন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া অনন্যমনে ও অক্লান্তভাবে যেন আনন্দের সহিত যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতেছিলেন। আজ তাঁহার সন্ন্যাস-কাল পূর্ণ হইল—আজ যথাপূর্ব্ব, করতোয়া হইতে সিকা-বাঁক সহ জল লইতে আসিয়া নদীতটে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী অদুনা পদুনা ও স্বীয় ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ হইল। তাঁহার আজ ধারণা হইল—অদুনা পদুনার কথা অগ্রাহ্য করিয়া বৃদ্ধা জননীর কথায় সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল অকথ্য যন্ত্রণা ও অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া বৃথা দুর্লভ জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

পঞ্চমখণ্ড-প্রত্যাগমন

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

'শারী-শুয়া গলে পত্র বান্ধিল যতনে।
রাজার উদ্দেশে পক্ষী উড়িল গগনে॥'
'কাঞ্চী অঙ্গুলি দিয়া বাঁও উরাত ফাড়িল।
ঐ রক্ত দিয়া লেখন লিখিবার লাগিল॥'

পক্ষি-দূত

করতোয়া নদীতটে রাজা গোপীচন্দ্রের, মহিষীগণের কথা স্মরণ হইবা মাত্র, পাটিকা নগরে অদুনা পদুনার হস্তধৃত 'সত্যের পাশা' এলাইয়া পড়িল।

পূর্ণ দ্বাদশ বর্ষকাল তাঁহাদের স্বামী দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—ত্রয়োদশ বর্ষ আগতপ্রায়। এইবার তিনি শূন্য-গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাদের বিরহখিন্ন তাপিত অঙ্গ শীতল করিবেন,—এই হেতু তাঁহাদের মনে ভবিষ্য-মিলনের কত আশা, কত কল্পনা, কত আনন্দ জাগিয়া উঠিতেছে—এমন সময় তাঁহাদের হস্তধৃত 'সত্যের পাশা' এলাইয়া পড়িলে, তাঁহারা রাজার প্রাণহানির আশঙ্কায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—'আমরা এতদিনে স্বামিহারা হইলাম—এখন আমরা কেমন করিয়া লোকের সমক্ষে বাহির হইয়া আমাদের এই পাপ-মুখ দেখাইব'!

পিঞ্জরস্থ শারী-শুক অদুনা পদুনা রাণীদ্বয়ের করুণ ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইল। তাহারা উভয়ে পরামর্শ

করিয়া পিঞ্জর ভগ্ন করিল এবং রাণীদ্বয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া, অকস্মাৎ তাঁহাদের এরূপ রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অদুনা পদুনা বলিলেন—"বাছা, তোদের পিতা বার বৎসর পরে দেশে প্রত্যাগমনের অঙ্গীকার করিয়া সন্ন্যাসাবলম্বনে দেশান্তরে গমন করিয়াছেন। এইবার তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের কাল সমাগত হইয়াছে। কিন্তু, এখনও তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না। এ দিকে, আমাদের হস্তধৃত 'সত্যের পাশা' এলাইয়া পড়িল! এই নিমিত্ত আমাদের মনে বড়ই আশঙ্কা হইতেছে, কি জানি তিনি কোথায় কোন্ অবস্থায় কেমন আছেন? তিনি সুস্থ শরীরে থাকিলে পাশা এলাইয়া পড়িত না!"—এই বলিয়া তাঁহারা উভয়েই পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

শারী-শুক এই কথা শ্রবণ করিয়া উৎসাহের সহিত বলিল—'মা, আপনারা আমাদিগকে আদেশ করুন, আমরা যেরূপে পারি, আমাদের পিতার সন্ধান করিয়া আসি।' রাণীদ্বয় শারী-শুকের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যেন অকূলপাথারে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—'যাও বাছা, তোমরা যে দিকে পার—তোমাদের পিতার সংবাদ আনিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা কর।' আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র, পক্ষিদ্বয় তাঁহাদের চরণপ্রান্তে প্রণাম করিয়া, গোপীচন্দ্রের উদ্দেশে আকাশমার্গে উড়িয়া গেল।

পক্ষিদ্বয় দেখিতে দেখিতে কত বন কত পর্ব্বত,

কত নদী কত প্রান্তর, কত দেশ কত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অবিরামগতিতে আকাশমার্গে নক্ষত্রবেগে উড্ডীন হইয়া চলিল ! 'এক-ঠেঙ্গিয়ার দেশ', 'কাণ-ফাড়ার দেশ', 'মশা রাজার দেশ', 'ত্রি-পাটনের দেশ' ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া তাহারা 'মেচপাড়ার দেশে' আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দেশে হেমাই পাত্তর-নামক একজন 'মেচ' আছে ; তাহার শরীর এমনই বিশাল যে, তাহার পৃষ্ঠদেশে দশমণ ধান্য মেলিয়া শুষ্ক করা যাইতে পারে ! তাহার কনিষ্ঠ সহোদর, বিরাট্ শ্লীপদে কাতর ও অত্যন্ত ভারগ্রস্ত হইয়া হস্তী বা অশ্বে চড়িয়া বেড়ায়। তাহার ভগিনী আবার রাক্ষসীবিশেষ—নয় হাঁড়ি পান্তা ও দশ হাঁড়ি তপ্ত অন্ন সে একাসনে ভক্ষণ করে ! সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনী হুতুমতানির শরীরেও এত বল যে, তাহাকে এককালে 'আশী-মর্দ্দে' মুষ্ট্যাঘাত করিলেও, তাহার চক্ষে জল-বিন্দুর উদ্ভব হয় না !

মেচপাড়ার দেশ অতিক্রম করিয়া পক্ষিদ্বয় ক্রমে ক্রমে গয়া, গঙ্গা, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি সর্ব্বত্রই রাজা গোপীচন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তখন তাহাদের মনে ধিক্কার জন্মিল এবং তাহারা আত্মহত্যা দ্বারা তাহাদের নিষ্ফল জীবনের অবসান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। এতদুদ্দেশে রাঘব-বোয়ালের উদরস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া এক প্রকাণ্ড খরস্রোতা নদীগর্ভে নিপতিত হইল। কিন্তু কোন বোয়াল

মৎস্যই তাহাদিগকে উদরস্থ করিতে সাহসী হইল না—কেন না, গঙ্গাদেবী তাহাদিগকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, এই পক্ষিদ্বয় ময়নামতীর নাতি—ইহাদিগকে উদরস্থ করিলে, তিনি বামহস্তে নদীর জল বাঁধিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহা ছাঁকিয়া ফেলিবেন—তখন আর রক্ষা নাই—পেটে পা' দিয়া মারিয়া ফেলিবেন।' পক্ষিদ্বয় অগত্যা অন্য ঘাটে উড়িয়া গেল।

এইরূপে একাদিক্রমে সাত দিন সাত রাত্রি উড়িয়া উড়িয়া, অবশেষে তাহারা দক্ষিণ পাটনে সমুদ্রতীরে হীরা-দারির দেশে এক নদীর ঘাটে, তুইটি বৃহৎ বট ও পাকুড় বৃক্ষ দেখিয়া, বটবৃক্ষে উপবেশন করিল। তদনন্তর তাহারা এ-ডাল ও-ডাল করিয়া বেড়াইবার সময় দেখিতে পাইল—গোপীচন্দ্রের ন্যায় এক ব্যক্তি, সিকা-বাঁক স্কন্ধে জল লইবার জন্য ধারপদে নদীর কূলে বৃক্ষতলে আসিয়া দন্তমার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। পক্ষিদ্বয় তখন, তাঁহার নিকটবর্ত্তী শাখায় বসিয়া আপন মনে উচ্চরবে বলিতে লাগিল—'তোমরা যদি কেহ বঙ্গের গোসাঞী রাজা গোপীচন্দ্র হও, তবে জানিও—আমরা তুইজনে তাঁহার সংবাদ লইতে আসিয়াছি।' এ স্থানে গোপীচন্দ্রের প্রকৃত নাম পর্য্যন্ত কেহ অবগত নহে—সকলেই তাহাকে 'বার-কড়ার গোলাম' বলিয়াই জানে; এখানে তাহার 'বাপ-ভাই' আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই—তবে কে তাঁহাকে তাঁহার নাম ধরিয়া এমন

মধুর সম্ভাষণ করিল ? গোপীচন্দ্র অত্যন্ত চমকিত হইয়া ইতস্ততঃ নেত্রপাত করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন—তাঁহার মস্তকোপরি বৃক্ষ-শাখায় শারী-শুক দুইটি পক্ষী বসিয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র তিনি আপনার প্রিয়তম পক্ষিযুগলকে চিনিতে পারিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পক্ষিযুগল এইবার গোপীচন্দ্রকে অভ্রান্তরূপে চিনিতে পারিয়া তাঁহার বাহুমূলে আসিয়া উপবিস্ট হইল। গোপীচন্দ্র সাশ্রুনয়নে তাহাদিগের নিকটে তাঁহার যাবতীয় দুঃখ-কস্টের আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। কঠোর পরিশ্রমে, অল্পাহার ও অযত্নে রাজার গৌর কান্তি মলিন হইয়াছে—সুগঠিত পুস্ট দেহ খর্ব্ব ও ক্ষীণ হইয়াছে—সর্ব্বাঙ্গের অস্থি-পঞ্জর যেন ভগ্ন হইয়াছে দেখিয়া, পক্ষিদ্বয় কাঁদিয়া আকুল হইল। পক্ষিদ্বয়ের নিকটে অদুনা-পদুনার মৃতপ্রায় অবস্থা ও রাজ্যের বিশৃঙ্খলার কথা শ্রবণ করিয়া গোপীচন্দ্রের শোকাবেগ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল—তাহার নেত্রযুগল হইতে ঝলকে ঝলকে অশ্রুপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল !

কিছুক্ষণ পর, উভয় পক্ষের প্রবল শোকোচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে রাজা গোপীচন্দ্র, পক্ষিগণের অনুরোধবশতঃ আজ সুদীর্ঘকাল পর অবগাহন করিলেন। পক্ষিদ্বয় তখন অদুনা-পদুনা-প্রেরিত ‘লাড়ু’ প্রদান করিলে, তিনি অতি আগ্রহের সহিত তাহা ভক্ষণ করিয়া কিয়দংশ পক্ষিযুগলকে প্রদান করিলেন।

এই প্রকারে জলযোগ শেষ হইলে, গোপীচন্দ্র দন্তদ্বারা একটি 'খাগড়াই' কলম বা লেখনী প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং মসীর পরিবর্ত্তে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নখাগ্রদ্বারা বাম উরু বিদীর্ণ করিয়া রক্তপাত করিলেন। তদনন্তর 'নাকড়ি' ও 'পাকড়ি' দুইখানি বৃক্ষপত্র সংগ্রহ করিয়া রক্তদ্বারা খাগড়াই লেখনী সহযোগে অদুনা পদুনার নামে একখানি ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ এবং অপর একখানি ময়নামতীর নিকটে কাতরোক্তিপূর্ণ—এই দুই খানি পত্র রচনা করিলেন। ময়নামতীকে তিনি সংক্ষেপে লিখিলেন—'আপনি যদি সুমাতা হন, আমায় এই দারুণ দুঃখ ও কষ্ট হইতে উদ্ধার করিবেন—কুমাতা হইলে আমায় চিরজীবন এই পাপ-পঙ্কেই নিমগ্ন রাখিবেন।'

পত্রদ্বয় রচনা করিয়া তিনি পক্ষিযুগলকে বলিলেন—'এই পত্রখানি তুমি তোমার বড়মা'র নিকটে এবং এই পত্রখানি আমার জননী ময়না রাণীর নিকটে প্রদান করিবে।' শারী-শুক রাজার চরণে প্রণাম করিয়া পত্রদ্বয় সহ উড়িয়া গেল!

এদিকে শারী-শুক যখন রাজা গোপীচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার সহিত যে ব্যক্তি সহচর বা প্রহরি-রূপে নিযুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ হীরার নিকটে গিয়া তাঁহার পলায়নোদ্যোগের কথা বিবৃত করিল। হীরাদারি, দূতের কথা শ্রবণ করিবামাত্র, দেশের যাবতীয় 'চিড়িমার' আহ্বান করিয়া সেই শারী-শুককে ধৃত করিবার আদেশ প্রদান করিল। তাহারা 'সাতনলা' 'আঠাকাঠি' ও

'জালদড়ী' লইয়া শারী-শুক ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সর্ববিধ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া শারী-শুক, রাজার পত্রদ্বয় সহ 'উধাও' হইয়া একবারে পাটিকা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শারী-শুক ময়নামতীর গৃহে চাল ছিদ্র করিয়া তাঁহাকে গোপীচন্দ্রের পত্র দিয়া বলিল—'রাজা গোপীচন্দ্র, অশেষ কষ্টে ও যন্ত্রণায় দিনযাপন করিতেছেন। যদি আপনি সুমাতা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবিলম্বেই উদ্ধার করুন।' পক্ষিদ্বয়ের এই কথা শেষ হইতে না হইতে, অদুনা-পদুনা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'মা, শুক শারীর নিকটে পত্র পাইয়া জানিলাম, আপনার পুত্র রাজা হইয়া গণিকার বাড়ীতে ভার বহন করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন! আপনি অবিলম্বেই ইহার প্রতিকার করুন।'

ময়নামতী পত্র পাঠ করিয়া এবং বধূগণের মুখে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি, তাঁহার কত সাধের একমাত্র পুত্র গোপীচন্দ্রকে হাড়িফার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন,—সেই হাড়িফার এইরূপ ব্যবহার! ময়নামতী তৎক্ষণাৎ ধ্যানস্থা হইয়া অবগত হইলেন—হাড়িফা গোপীচন্দ্রকে হীরা-নটীর গৃহে বন্ধক রাখিয়া চৌদ্দতাল জলের নিম্নে নিশ্চিন্তমনে যোগস্থ হইয়া অবস্থান করিতেছেন!

ময়নামতী ধ্যানস্থ হাড়িফার উদ্দেশে এক 'বজ্র-চাপড়'

মারিলেন। উহার প্রচণ্ড আঘাতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধ্যানযোগে ইহা ময়নামতীর কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ময়নামতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—'দিদি, আমি এতদিন আপনার পুত্রের কোন সংবাদ লই নাই। এখন কিন্তু, গোপীচন্দ্রকে উদ্ধার না করিয়া গঞ্জিকা সেবন করিব না।' ময়নামতী বলিলেন—'যদি আমার পুত্রের আশানুরূপ জ্ঞান লাভ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিও, আমি তোমাকে তদ্দণ্ডেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব।'

হাড়িসিদ্ধা ময়নামতীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তদ্দণ্ডেই গোপীচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

'ওঠে এলা হাড়িসিদ্ধা গাও মোড়া দিয়া।
সর্গতে ঠেকিল মাথা হুটুস্ করিয়া॥'
'নটীর হাতত খতখান হাড়ির হাতত দিল।
রাম রাম বলিয়া খত ফাড়িয়া ফেলিল'॥

গোপীচন্দ্রের উদ্ধার ও জ্ঞানলাভ

হাড়িফা, তাঁহার 'বায়াম্ন-মণী' কন্থা কটিদেশে বন্ধন করিয়া 'নয়মণিয়া' খড়ম পরিধান করিলেন এবং বক্ষোদেশে ভস্ম ও ধূলি মর্দ্দিত করিয়া গাত্র মোটনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন—তাঁহার মস্তক 'হুটুস্' করিয়া স্বর্গ স্পর্শ করিল। তদনন্তর পঞ্চাশমণ 'সিদ্ধি'-চূর্ণ, দশকলসী জলসহযোগে গলাধঃকরণ করিয়া গোপীচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

বিরাশী ক্রোশ অন্তর এক এক পদক্ষেপ করিয়া হাড়িফা অচিরেই করতোয়া নদীতটে উপস্থিত হইলেন। গোপীচন্দ্র, সেই সময়ে জল লইবার জন্য ভার-স্কন্ধে নদীতীরে আগমন করিয়াছেন—রাজার তখনও একভার জল লইতে বাকী আছে। কিন্তু, তিনি গুরু হাড়িসিদ্ধাকে দেখিতে পাইবা মাত্র, সিকা-বাঁক নদী-স্রোতে ভাসাইয়া কলসী দুইটি ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন।

হাড়িফা ধর্ম্মী রাজাকে ঝোলার মধ্যে পূরিয়া হীরা-

দারির দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং বিকট হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া দামামায় অবিরাম আঘাত করিতে লাগিলেন—দামামার ভীষণ শব্দে হীরা-নটীর পুরী, ভূমিকম্পের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। হীরা-নটী শব্দ শুনিয়া বান্দীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'কোথাকার কোন্ অতিথি আসিয়াছে—তাহাকে বিদায় করিয়া দাও'। বান্দী দ্বারদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া হীরাকে সংবাদ দিল—'অতিথি অপর কেহ নহে—সেই হাড়ি-সিদ্ধা, 'বার-কড়ার গোলাম'কে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে।

গোপীচন্দ্রকে, হীরা-নটী যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সে তাঁহাকে হাড়িফার সমক্ষে তদবস্থায় আনয়ন করিতে স্বভাবতঃই ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এই নিমিত্ত, হীরা-নটী তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত না হইয়া লুক্কায়িত রহিল। হাড়িফার নিকটে ইহা অজ্ঞাত রহিল না—তিনি তাঁহার হস্তস্থিত 'আসা-লড়ীকে' সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আসা-লড়ী',তুমি এখনই হীরা-নটীকে গলায় বাঁধিয়া আমার নিকটে উপস্থাপিত কর।" আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র, 'আসা-লড়ী' ভয়ঙ্কর গর্জ্জনসহকারে হীরা-নটীর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে ধাক্কা মারিতে মারিতে বাহির করিয়া আনিল। হীরা, হাড়িফার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কম্পান্বিতকলেবরে বলিল—'আমি গোপীচন্দ্রকে আপনার নিকটে আনয়ন করিতেছি—আমায় কিছুক্ষণ সময় দি'ন।'

হাড়িফা, হীরার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

হীরা-নটী পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দাসদাসীবৃন্দকে, গোপীচন্দ্রের উত্তমরূপ বেশভূষা করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিল। কিন্তু গোপীচন্দ্র কোথায়? বান্দীগণ বলিল—'বারকড়ার গোলাম' জল আনিতে গিয়াছে—এখনও প্রত্যাগমন করে নাই।" নদীতীরে তৎক্ষণাৎ অনুচর প্রেরিত হইল—সেখানে গোপীচন্দ্রকে পাইল না। ভগ্ন কলসী দেখিয়া বান্দী অনুমান করিয়া বলিল—'সে নদীর খর-স্রোতে পতিত হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে—তাহার মৃত্যু হইয়াছে।' এদিকে নির্দ্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় হাড়িফা গোপীচন্দ্রকে আনয়ন করিবার জন্য হীরা-নটীকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। হীরা মহাবিপদে পড়িল!

হীরা অগত্যা হাড়িফার নিকটে উপস্থিত হইয়া নানারূপ ভাণ করিতে লাগিল। কখন বলিল—গোপীচন্দ্র বন্দরের বাজারে পাশা ক্রীড়া করিতে গিয়াছে, এখনও প্রত্যাগমন করে নাই;—কখন বলিল—'সে অতিশয় মৃগয়া-প্রিয়, কোন বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছে, এখনও প্রত্যাগমন করে নাই, এবং হিংস্র বন্য জন্তুর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অক্ষতদেহে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন কি না, তাহারও স্থিরতা নাই'—ইত্যাকার ছলনা-জাল বিস্তার করিয়া একদিনমাত্র সময় প্রার্থনা করিল। হাড়িফা

অসম্মত হইলেন না; কিন্তু তাঁহার পক্ষে, মুহূর্ত্তমধ্যে 'অদ্য কে' 'কল্যে' পরিণত করা কঠিন কর্ম্ম নহে। তিনি চন্দ্র-সূর্য্যকে, তাঁহার দুই কর্ণকুহরে লুকায়িত রাখিলেন—সুতরাং, অবিলম্বেই প্রার্থিত দিবা ও রাত্রির অবসান হইয়া গেল! অরুণালোকে পূর্ব্বদিক্ 'ঝিক্‌মিক্' করিয়া উঠিল এবং শ্বেত-কাক, তারস্বরে নিশাবসানের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল। এইরূপে একদিবস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল; কিন্তু হীরা গোপীচন্দ্রকে আনয়ন করিতে পারিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া সে হাড়িফার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া, তাঁহার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

হাড়িফা ইঙ্গিত করিবামাত্র, তাঁহার ঝোলার মধ্য হইতে গোপীচন্দ্র বহির্গত হইলেন। হীরা-নটী ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল! হাড়িফা, প্রোথিত বার-কড়া কড়ি উত্তোলনপূর্ব্বক হীরার হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহার স্বাক্ষরিত 'খত' বা দলিল আনয়ন করিতে বলিলেন। হীরা, তদ্দণ্ডেই 'খত' খানি হাড়িফার হস্তে প্রত্যর্পণ করিল—তিনি 'রাম-রাম' বলিয়া খতখানি 'ফাড়িয়া' ফেলিলেন।

কিন্তু, রাজা গোপীচন্দ্রের প্রতি হীরা-নটীর দুর্ব্ব্যবহার ও অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান করিতে হইবে। এই নিমিত্ত হাড়িফা, এক হাঁড়ি গঙ্গাজল আনয়ন করাইলেন এবং সাতজন অনুচর, হীরা-নটীকে ভূপাতিত করিয়া 'বাইশমণী' খড়ম সহ রাজা গোপীচন্দ্রকে তাহার বুকের

উপর সমারূঢ় করাইলেন। হীরা-নটী, রাজা গোপীচন্দ্রও 'বাইশমণী' খড়মের গুরুভারে কাতর হইয়া, যতই নড়িতে চেষ্টা করিতে লাগিল—গুরুভার ততই গুরুতর হইয়া তাহার 'বত্রিশ পাঁজর' ভাঙ্গিয়া যেন গুঁড়া করিয়া ফেলিতে লাগিল! তৎপরে রাজা, 'বাইশমণী' খড়ম পায়ে দিয়া হীরার বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া 'রাম-রাম' উচ্চারণপূর্ব্বক মস্তকে গঙ্গাজল ঢালিয়া দিলেন—তাঁহার যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল। স্নানান্তে তাঁহার অঙ্গ-জ্যোতি মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় সমধিক ভাস্বর ও উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইল।

গোপীচন্দ্রের স্নান সমাপ্ত হইলে, হাড়িফা বলিলেন—'বৎস, তুমি সিক্ত-বস্ত্র ত্যাগ করিয়া এই শুষ্ক পট্টবস্ত্র পরিধান কর। তুমি আজ দ্বাদশবর্ষকাল হীরা-নটীর গৃহে কঠোরতম তপস্যায় নিযুক্ত ছিলে—এখন তোমায় তোমার তপস্যা-লব্ধ ফলের কিঞ্চিৎ প্রভাব প্রদর্শন করিতেছি—মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য কর'।—এই বলিয়া তিনি হীরা-নটীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—'তুই ঘোর অপকর্ম্ম করিয়াছিস্—'আমি অভিসম্পাত করিতেছি, তুই মানবদেহের পরিবর্ত্তে বুল্‌বুল্ পক্ষীর আকৃতি ধারণ করিয়া এই রাজ্যে বাস করিবি।' হীরা-নটী এই 'বর' প্রাপ্ত হইবামাত্র বুল্‌বুল্ পক্ষিরূপে পরিণত হইয়া স্বর্গাভিমুখে উড়িয়া চলিল। হাড়িফা তৎক্ষণাৎ বাম হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং 'দুইখান' করিয়া, পূর্ব্বার্দ্ধ স্বর্গে উড়াইয়া

দিলেন এবং অপরার্দ্ধ 'দরিয়ায়' নিক্ষেপ করিলেন। তথায় হীরা-নটী, চাঁদা মাছ হইয়া জলমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। হাড়িফা, হীরার বান্দীগণের গণিকারূপে, এবং তাহার যাবতীয় ধন-রত্ন ও ঘরবাড়ী 'লণ্ডভণ্ড' করিয়া, 'খোলা'রূপে পরিণত করিয়া দিলেন।

তদনন্তর হাড়িফা রাজা গোপীচন্দ্রকে 'বলিলেন,—বৎস, তুমি বন্দরে গিয়া কিছু ভিক্ষা করিয়া আন—এই স্থানে আমরা রন্ধন করিয়া কিছু অন্ন ভক্ষণ করি। হাড়িফার আদেশ শ্রবণ করিয়া গোপীচন্দ্র বলিলেন—'আমি নামতঃ ব্রহ্মচারী হইলেও রাজার পুত্র, কেমন করিয়া ভিক্ষা করিতে হয়, জানি না।' হাড়িফা, তাঁহাকে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করিলেন ; কিন্তু স্বয়ং 'নেঙ্গড়ী কোটওয়ালের' মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায়, রাজার অজ্ঞাতসারে প্রতি গৃহে বলিয়া আসিলেন—'একজন অতি সুন্দর তরুণ ব্রহ্মচারী তোমাদের বন্দরে অচিরে ভিক্ষা করিতে আসিবে—সাবধান, তোমরা তাহাকে ভিক্ষা প্রদান করিও না—দ্বার অর্গলবদ্ধ রাখিয়া সম্মুখে শিকারী কুকুর প্রহরী নিযুক্ত রাখিবে।' গৃহস্থগণ হাড়িফার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সতর্ক রহিল।

এদিকে,রাজা গোপীচন্দ্র ভিক্ষার্থ বন্দরে প্রস্থান করিলে, হাড়িফা তুড়্-তুড়্ শব্দ করিয়া হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ হইতে পঞ্চ-কন্যা, পঞ্চথালা অন্নসহ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল। হাড়িসিদ্ধা সেই অন্ন ভোজন

করিলেন এবং ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের মধ্যে 'আড়াই পুটি' জ্ঞান মিশ্রিত করিয়া গোপীচন্দ্রের জন্য রাখিয়া দিলেন। এই উচ্ছিষ্ট অন্নমধ্যে হাড়িফা, আপনার শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনাদি মিশ্রিত করিয়া 'মোড়া মিশ্রির রস' মাখিয়া রাখিলেন।

রাজা গোপীচন্দ্র, হাড়িফার আদেশানুসারে ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া গৃহস্থগণের ভর্ৎসনা এবং শিকারী কুকুরের তাড়না সহ্য করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন— 'গুরুধন, এ দেশের লোকসকল বড়ই নিষ্ঠুর—ভিক্ষা ত দিলই না, বরং কুকুর 'লেলাইয়া' দিল। হাড়িফা বলিলেন— 'বৎস, তুমি ভিক্ষা না পাইয়া থাকিলে কোন ক্ষতি নাই— পথিমধ্যে এক সতী নারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাদিগের জন্য কিছু অন্ন দিয়াছিলেন—আমি ভোজন করিয়া তোমার অংশ যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়াছি— ভক্ষণ কর'।

গোপীচন্দ্র, তাঁহার জন্য রক্ষিত অন্নের নিকটে উপস্থিত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—'এই অন্ন পিপীলিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—ইহার উপর মাছি 'ঘিন্-ঘিন্' করিতেছে—এরূপ অন্ন আমার কুকুরেও খাইতে পারে না—আমি কেমন করিয়া এই উচ্ছিষ্ট অন্ন গলাধঃকরণ করিব'। ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণে গোপীচন্দ্রের ঘৃণা ও সঙ্কোচ দেখিয়া হাড়িফা তুড়্-তুড়্ শব্দে হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে গোপীচন্দ্রের শরীরে বার বৎসরের

ক্ষুধা জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। তিনি, 'ছি-ছি ঘিন্-ঘিন্' করিয়া এক. গ্রাস মুখে আস্বাদন করিয়া দেখিলেন—অমৃত! এইরূপে দ্বিতীয় গ্রাস ভক্ষণ করিয়া তৃতীয় গ্রাস গ্রহণ করিবেন, এমন সময়ে হাড়িফা তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন, রাজা কাড়াকাড়ি করিয়া অর্দ্ধগ্রাস ভক্ষণ করিলেন। ফলতঃ, গোপীচন্দ্র, সর্ব্বসমেত আড়াই গ্রাস অন্ন ভক্ষণ করিয়া 'আড়াই পুটি' জ্ঞান লাভ করিলেন।

গোপীচন্দ্র এইরূপে 'আড়াই পুটি' জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, হাড়িফা বলিলেন—'তুমি শীঘ্রই বাটী প্রত্যাগমন করিবে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমার যমালয় দর্শন করিয়া অতিরিক্ত জ্ঞান-সঞ্চয় ও সঞ্চিত-জ্ঞানের পুষ্টিসাধন করা প্রয়োজন। এই সংসার অনাচার অত্যাচারে পরিপূর্ণ—ইষ্ট মিত্র, পুত্র কন্যা—এ সকল কেহ কাহারও নহে—সকলই শূন্যের মায়া! ইহারা জোয়ারের জলের ন্যায় আগমন করে—আর ভাটার জলের ন্যায় চলিয়া যায়।' এই বলিয়া হাড়িফা, রাজা গোপীচন্দ্র সহ যমপুরীতে সশরীরে উপস্থিত হইলেন। গোপীচন্দ্র, সুবর্ণ-নির্ম্মিত যমপুরীতে আগমন করিয়া সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মাবতার নিরঞ্জন দেবকে দেখিতে পাইলেন। যমপুরীর চারি দ্বার—পূর্ব্বদ্বারে দেবগণ, পশ্চিমদ্বারে যোগসিদ্ধা ঋষিগণ এবং উত্তরদ্বারে তপস্বিগণ রহিয়াছেন। কিন্তু, দক্ষিণদ্বারে উপস্থিত হইয়া গোপীচন্দ্র উচ্চরবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। এই দ্বারের সম্মুখে সূচীভেদ্য ঘনঘোর তমসাচ্ছন্ন চুরাশী

নরককুণ্ড—ইহাতে সকল সংসার পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছে এবং অদূরে গৃধ্র ও শৃগাল-কুক্কুরের দল কোলাহল করিতেছে। এইস্থানে সুশ্যামলকায় যমরাজ স্বয়ং হস্তে লৌহদণ্ড ধারণ করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন—তাঁহার পার্শ্বে চিত্রগুপ্ত বিচারকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়া পাপের অনুপাতে দণ্ডপ্রদান করিতেছেন। এই সব দৃশ্য দেখিয়া গোপীচন্দ্র ভীত হইলেন এবং হাড়িফাকে কোন্ পাপ করিলে কি দণ্ডবিধান হয়, এবং কোন্ 'ধর্ম্ম' করিলে স্বর্গলাভ ঘটে, জিজ্ঞাসা করিলেন।

হাড়িফা বলিলেন—'বৎস, পরস্বাপহরণ বা পরগৃহে অগ্নিসংযোগ করিলে, যমদূত তাহাকে অধঃমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করে। পিতৃকার্য্যে অবহেলা, ব্রাহ্মণ বা গুরু অতিক্রম বা ব্রাহ্মণের ধন হরণ করিলে সপ্তপুরুষ নরক ভোগ করে। আশ্বাস প্রদান করিয়া উপকার না করিলে, অপরের দানের হন্তারক হইলে, দেবতার মন্দিরাদি নষ্ট করিলে, তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। ধনবান্ হইয়া কৃপণ হইলে, শরণাপন্ন ব্যক্তিকে প্রতিপালন না করিলে, অতিথির বা অপরের গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ না করিলে তাহাকে যমদূত বন্ধন করিয়া লইয়া যায়।'

এই কথা শুনিয়া গোপীচন্দ্র বলিলেন—'গুরুদেব, তবে আমরা কোন্ কর্ম্ম করিলে এই ভীষণ নরক-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি! হাড়িফা বলিলেন—'বৎস, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম—ইহার উপর ধর্ম্ম নাই। যে ব্যক্তি

সত্যবাদী ও পরোপকারক, তাঁহার গোলোক-প্রাপ্তি হয়। যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা করেন, তাঁহার বৈকুণ্ঠ-লাভ হয়। যিনি সরোবর ও জাঙ্গাল রচনা করিয়া জনসাধারণের উপকারসাধন করেন, তিনি পরজন্মে 'মহীপাল' হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যিনি দুঃখী বা দরিদ্রকে দয়া করেন, অতিথিকে প্রতিপালন করেন, তিনি অশেষ পাপী হইলেও, যম তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। সত্যকথনে স্বর্গলাভ এবং মিথ্যাবাক্যে অল্লায়ু হয়'।

এইরূপে যমালয় দর্শনে ও হাড়িফার সদুপদেশ লাভে, গোপীচন্দ্রের 'আড়াইপুটি' জ্ঞান পুষ্ট ও পরিপক্ক হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

'রাজাকে পাইয়া সভার ঘুচিল হতাশ।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥'
'দেড়বুড়ি কড়ি খাজনা সাধিবার লাগিল।
রাজার রায়ত সুখময় হইল ॥'

প্রত্যাগমন

হাড়িফার হুঙ্কারে গোপীচন্দ্রের পূর্ব্বকথা স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে, তিনি গৃহে প্রত্যাগমনজন্য সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি আমাকে 'আলগ্-রথে' আরোহণ করাইয়া সত্বর গৃহে লইয়া চলুন—মহিষীগণ ও 'ঘরবাড়ী' প্রভৃতি দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হই।"

গৃহে প্রত্যাগমনে রাজার আগ্রহাতিশয্য এবং অত্যধিক ব্যাকুলতা দর্শনে, হাড়িফা তাঁহাকে সানন্দে অনুমতি প্রদান করিয়া আপনার হস্তের 'আসা-লড়ী', রাজার হস্তে তুলিয়া দিলেন। রাজার দুলাল গোপীচন্দ্র, হাড়িফার চরণে প্রণাম করিয়া 'আশীমণী' আসালড়া স্কন্ধে লইয়া পাটিকানগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হাড়িফা, রাজার ব্যগ্র পদক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া, 'খল্-খল্' হাস্য করিতে লাগিলেন।

গোপীচন্দ্র অবিলম্বে স্বীয় রাজধানী পাটিকানগরপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ণ দ্বাদশবর্ষকাল পরে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া কত পরিবর্ত্তন, কত রূপান্তর দর্শন করিলেন! তিনি দেখিলেন—রাজধানীর সে শ্রী, সে

সৌন্দর্য্য নাই—সমস্তই যেন শ্রীহীন ও মলিন! তাঁহার প্রিয় রাজধানীর এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। অদূরে মাঠে এক রাখাল গরু চরাইতেছিল; তাহার নিকটস্থ হইয়া সংবাদ লইবার ছলে রাজবাড়ীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—'ঐ যে সুপারী ও নারিকেল বাগানের মধ্যে অট্টালিকা দেখা যাইতেছে, ওটি কাহার বাড়ী বলিতে পার'? রাখাল বলিল—'সে অনেক দিনের কথা, আমাদের মনে হয় না—এখানে এক রাজা ছিল, সে অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে সে রীতিমত পোষণ করিতে অসমর্থ হইয়া, উদাসীন হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার আর কোন সংবাদ কেহই বলিতে পারে না'। গোপীচন্দ্র, রাখালের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে ইতরসাধারণের ধারণার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় ক্ষুণ্ন হইলেন।

রাজা গোপীচন্দ্র ভিক্ষুকের বেশ পরিগ্রহ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজবাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া শিঙ্গায় ফুৎকার প্রদান করিবামাত্র দ্বারদেশের বৃহৎ ঘণ্টা বিনা আঘাতে বাজিয়া উঠিল—বিনা অগ্নিতে 'দুগ্ধ-চাউল' উথলিয়া পড়িল—ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল—চৌদ্দখান জলমগ্ন 'মধুকর' ভাসিয়া উঠিল—গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসব করিল—নিদ্রাগতা মহিষীগণ শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন।

শিঙ্গা-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহিষীগণ, 'অতিথি-ভিক্ষুক আসিয়াছে মনে করিয়া পরিচারিকা দ্বারা ভিক্ষা-দ্রব্য সুসজ্জিত করিয়া প্রেরণ করিলেন। ভিক্ষা-হস্তে পরিচারিকাকে দেখিয়া ভিক্ষুক বলিলেন—"আমি দক্ষিণ দেশের অতিথি-ব্রহ্মচারী, আমি পরিচারিকার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করি না। 'সাহেবানী' সকল স্বহস্তে ভিক্ষা প্রদান করিলে গ্রহণ করিতে পারি,—অপর কাহারও হস্তে কুমার-ব্রহ্মচারী ভিক্ষা গ্রহণ করে না।" এইরূপে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া পরিচারিকা, ভিক্ষুকের উপর রাগান্বিতা হইয়া বলিল—"কোথাকার 'উঞ্ছ' অতিথি! ভিক্ষা না লইবে ত যতক্ষণ ইচ্ছা, চুপ্ করিয়া বসিয়া থাক।" এই বলিয়া ক্রন্দনোন্মুখী হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে ভিক্ষা-দ্রব্যাদিসহ প্রত্যাগমন করিল। অদুনা পদুনা পরিচারিকার নিকটে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, দুই জনেই ভিক্ষা লইয়া অর্গলবদ্ধ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইবামাত্র 'ধর্ম্মের কপাট' বিনা চাবীতে খুলিয়া গেল।

ভিক্ষাহস্তে অদুনা-পদুনা বহির্দ্বারে আসিয়া ভিক্ষুককে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'অতিথি-গোসাঞী, আপনার জন্য ভিক্ষা আনিয়াছি—শীঘ্র গ্রহণ করুন। অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া আমরা অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না!' অতিথি বলিলেন—"আমরা 'পূর্ব্বভাগের' অতিথি, আমরা নারী-হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করি না। তোমাদের স্বামী স্বহস্তে ভিক্ষা প্রদান করিলে লইতে পারি—নচেৎ নহে।'

রাণীগণ ভিক্ষুকের হস্তে অঙ্গুরীয় দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রহ্মচারী হইয়া আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন? ছদ্মবেশধারী রাজা গোপীচন্দ্র বলিলেন—"আপনাদের রাজা ও আমি এক গুরুর শিষ্য। একদিন প্রদোষকালে আমরা এক গৃহস্থের বাড়ী অতিথি হইলে, গৃহস্বামী আমাদের সেবার জন্য 'বিন্নী' ধানের চাউল, ও 'ঠাকুরী'-কলাইএর ডাল প্রদান করিল। আপনাদের ক্ষুধার্ত্ত রাজা, অতিমাত্রায় ভোজন করিয়া, সেই রাত্রেই 'ভেদ-বমীর' পীড়ায় পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কাহাকেও ঝুলি-কাঁথা, কাহাকেও বা তাঁহার 'দণ্ড' দান করিয়াছিলেন। আমার সহিত তাঁহার বেশী প্রণয় ছিল—সেই জন্য আমায়, তাঁহার হস্তের এই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দান করিয়াছেন।"

বিরহখিন্না অদুনা-পদুনা রাণী, অতিথির এই কথা সত্য মনে করিয়া ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন গোপীচন্দ্র, হাস্য সংবরণ করিতে না পারিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু, বহুদিন পর আকৃতির বহুল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই নিমিত্ত রাণীগণ মনে মনে সন্দিহান হইয়া, অতিথি-ভিক্ষুককে একবারে নিঃসন্দিগ্ধভাবে রাজা গোপীচন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন এবং পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সংশয় অপনোদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অদুনা পদুনা প্রথমতঃ রক্ষী কুকুরগুলিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি দেখিলেই, এই কুকুর-গুলি স্বভাবতঃই তাহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। কিন্তু এই অতিথিকে দেখিয়া তাহারা তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করা দূরে থাকুকু, তাঁহার পদতলে লুটাইয়া তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাতেও রাণীগণের মন সংশয়শূন্য হইল না—তাঁহারা রাজহস্তীর শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিলেন। রাজহস্তী শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া শুণ্ডোত্তোলন-পূর্ব্বক বৃংহিত করিতে করিতে হস্তিশালা হইতে বহির্গত হইয়া প্রাঙ্গণে ছদ্মবেশী গোপীচন্দ্রকে দেখিতে পাইল। দীর্ঘকাল পর মুক্তি লাভ করিয়া হস্তী মহাস্ফূর্ত্তির সহিত ছুটিয়া বাহির হইবার সময় রাজাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্ব শিক্ষা ও অভ্যাসবশতঃ হাঁটু গাড়িয়া ও মস্তক নত করিয়া প্রণাম বিজ্ঞাপিত করিল। প্রণামান্তে হস্তী উত্থিত হইয়া গোপীচন্দ্রকে শুণ্ডদ্বারা একবারে আপন পৃষ্ঠে তুলিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিল।

রাজা হস্তিপৃষ্ঠে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলে, অদুনা-পদুনা তথায় উপস্থিত হইলেন—তাঁহাদের সকল সংশয় দূরীভূত হইল। তাঁহারা রাজাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন—তৎক্ষণাৎ, দ্বার-দেশে লম্বিত 'জোড়-দামামা' আপনা আপনি বাজিয়া উঠিল। আজ সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ পরে তাঁহাদের মিলন হইল। আনন্দে

তাঁহাদের বাক্য স্ফূর্ত্তি পাইল না—নীরবে আনন্দবর্ষণে তাঁহাদের হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত করিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে, তাঁহারা স্থূল-ভাবে রাজার প্রবাসের সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার মলিন বেশ প্রসাধিত করিয়া দিলেন!

গোপীচন্দ্র, অন্তঃপুরে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিলেন না—তিনি এখনও জননী ময়নামতীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ময়নামতী ফেরুসানগরে আপনার 'বাঙ্গলায়' বসিয়া চরকা কাটিতেছিলেন—গোপীচন্দ্র স্বর্ণ-ভ্রমরের রূপ ধারণ করিয়া অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া মন্ত্রবলে তাঁহার কর-চালিত চরকা শূন্যে উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু ময়নামতী সামান্যা নারী নহেন—তিনি গুরু-গোরক্ষনাথের বরপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তদুপরি, তাঁহার মন্ত্র-বৈভব অসাধারণ। সুতরাং ময়নামতী তৎক্ষণাৎ চটক-পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া চরকা ধরিয়া ফেলিলেন। এইরূপে শক্তির পরিচয় ও বিনিময় হইলে, দীর্ঘকাল পরে মাতাপুত্রের মিলন হইল! 'বৎস, দুঃখিনীর দুলাল আমার' —বলিয়া ময়নামতী, গোপীচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইলেন। রাজা, মস্তকের কেশরাশি দ্বিধা ভিন্ন করিয়া জননীর চরণতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

গোপীচন্দ্রের প্রত্যাগমনবার্ত্তা রাজধানী ও দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। দীন-দুঃখী, কৃষক-'সাধু' সকলেরই অন্তরে

আনন্দলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রজাসাধারণের দ্বাদশবর্ষের মলিন মুখ আজ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—পশু-পক্ষিগণের আনন্দ-কলরবে, সুরভি পুষ্পনিচয়ের পূর্ণ বিকাশে, নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে তরণীর পুলক-নর্ত্তনে আজ সমগ্র প্রকৃতি-রাজ্য যেন আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মধুনাপিত রাজার ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিলেন। রাজা গোপীচন্দ্র দীনদুঃখীদিগকে সাতগোলা ধান বিতরণ করিয়া দিলেন এবং গাভীর লাঙ্গুল ধরিয়া 'বৈতরণী পার' হইলেন।

তদনন্তর ময়নামতী পাঁচ লোটা জলে স্নান করিয়া তাড়াতাড়ি এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন এবং তিনটি থালায় সজ্জিত করিয়া হাড়িফার উদ্দেশে হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন। হাড়িফা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ময়না রাণী অন্নের প্রথম থালা হাড়িফাকে পরিবেষণ করিয়া দিলেন, দ্বিতীয় থালার অন্ন নিজে লইলেন এবং তৃতীর থালা গোপীচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। হাড়িফা, হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া দেবতা স্মরণপূর্ব্বক এক গ্রাস দুই গ্রাস—পঞ্চগ্রাস অন্ন ভক্ষণ করিলেন এবং ঝারির সুবাসিত জলে আচমন করিলেন। আহারান্তে রাজার মস্তকে বামপদ স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক 'কৈলাসের হাড়ি', কৈলাসে প্রস্থান করিলেন।

রাজা গোপীচন্দ্র রাজবেশে সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান

হইলে, রাজহস্তী ধীরমন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া শুণ্ডোত্তোলন দ্বারা আনন্দ বা আশীর্ব্বাদ এবং মস্তক নত করিয়া প্রণাম বিজ্ঞাপিত করিল! শত শত বাদ্য যুগপৎ বাজিয়া, রাজার সিংহাসনারোহণ-বার্ত্তা দেশময় বিঘোষিত করিয়া দিল। ময়নার হুঙ্কারে স্বর্গের দেবতাগণ গোপীচন্দ্রের অভিষেকোৎসবে উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন।

রাজা গোপীচন্দ্র, প্রজাগণের নিকট হইতে 'পনর গণ্ডার' পরিবর্ত্তে 'দেড়বুড়ী' খাজনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাজার রাজ্য সুখময় হইল—প্রজাসাধারণের বিগত সুখের দিন পুনরাগত হইল।

পরিশিষ্ট-দ্বিতীয় সন্ন্যাস

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

'সিদ্ধা নহে হাড়িফা ভোজ বিদ্যা জানে।
বেড়াইয়া দুঃখ পাইলে বেউস্যা ভবনে'॥
'হাড়িফার উপর হইল জ্বলন্ত আগুনি'।
'গাড়িয়া ফেলাও চণ্ডাল জালন্ধরী'॥

মিলনানন্দ—মৃত্তিকাগর্ভে হাড়িফা

সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর, গোপীচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া রাণীগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না—তাঁহারা যেন হস্তে আকাশ স্পর্শ করিলেন। তাঁহারা রাজার মলিন বেশ দেখিয়া অবিলম্বেই সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে সুবাসিত শীতল জল আনিয়া তাঁহাকে স্নান করাইলেন এবং মস্তকের কেশ দিয়া তাঁহার চরণযুগল মুছাইয়া দিলেন। তদনন্তর, উত্তম পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করাইলেন।

শয়ন-কক্ষে নানাবিধ কথোপকথনের পর অদুনা রাণী বলিলেন—আমি, শুকদ্বারা প্রেরিত আপনার পত্রখানি পরম যত্নসহকারে রক্ষা করিয়াছি। আপনি 'বঙ্গের ঈশ্বর' হইয়া হাড়ি-সেবা দ্বারা কি অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, আমাদিগকে প্রত্যক্ষ না দেখাইলে, আমরা কেমন করিয়া তাহা বিশ্বাস করিব'?

গোপীচন্দ্র, রাণীগণের মায়ায় মুগ্ধ হইলেন না। তিনি বলিলেন—'গুরু কৃপা করিয়া আমায় 'মহাজ্ঞান' প্রদান করিয়াছেন—রজনী প্রভাত হইলে, আমি পুনরায় দেশান্তরে গমন করিব—তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় সুখে রাজ্য শাসন কর'। এই কথা শুনিয়া রাণীগণের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল—সমগ্র আকাশ যেন তাঁহাদের মস্তকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহারা বলিলেন—এত দীর্ঘকাল পর দেশে প্রত্যাগমন করিলেন, আবার নিশাবসানে চলিয়া যাইবেন,—এতগুলি রাণী আপনি কোন্ প্রাণে অনাথা করিবেন? জন্মিলেই মরণ অবধারিত—কোথায় কে কবে অমরত্ব লাভ করিয়াছে? তবে কোন্ আশায় বুক বাঁধিয়া আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? আপনি কাহার হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া দেশান্তরিত হইবেন? আপনি চলিয়া গেলে আমরা কোন্ প্রাণে বাঁচিয়া থাকিব?—আমাদের তখন বিষপানে আত্মহত্যা ভিন্ন গত্যন্তর রহিবে না'।

গোপীচন্দ্র বলিলেন—'আমি গুরুর সহিত স্বচক্ষে যমালয়ে পাপিগণের যন্ত্রণা দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি—সংসারে রহিলেই কোন-না-কোন-প্রকার পাপ আচরণ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং, আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ যম-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব'। রাজার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণীগণ সকলেই

এককালে হাস্য করিয়া বলিলেন—'আপনার বাক্যে আমরা আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না—যমালয় দর্শন করিয়া কি কেহ প্রত্যাগমন করিতে পারে—ইহা কি সম্ভব হয়! ও-সকল কিছুই নয়—ভোজবাজী মাত্র! আপনি কি-প্রকার ভোজ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করুন'।

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইল। 'বঙ্গের ঈশ্বর' রাজা গোপীচন্দ্র, তাঁহার মহিষীগণকে তাঁহার মহাজ্ঞানের প্রভাব প্রদর্শন করিবার জন্য গুরু স্মরণপূর্ব্বক ধ্যানযোগে উপবিষ্ট হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্তর্ধান হইলেন: মহিষীগণ, হঠাৎ রাজার অদর্শনে কাঁদিয়া আকুল হইলেন এবং ধরণীতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মহিষীগণের কাতর-ক্রন্দনে রাজা সহাস্যবদনে তথায় পুনরাবির্ভূত হইলেন—তাঁহারা রাজার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের তৃপ্তি হইল না। তাঁহারা বলিলেন—'এসকল ব্যাপার একবারমাত্র দেখিয়া সংসারে কাহারও প্রত্যয় হয় না। তবে আমাদেরই বা কেমন করিয়া হইবে'? রাজা তাঁহাদের সাগ্রহ প্রার্থনানু-যায়ী জলন্ধরী হাড়ি-সিদ্ধার চরণ স্মরণপূর্ব্বক সেই স্থানে প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডরূপে পরিণত হইলেন—রাণীগণ অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া দূরে দূরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ

পর রাজা স্বরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বাস্থ হইয়া বসিলে রাণী-গণ হাস্যমুখে তাঁহার সমীপস্থা হইলেন। তাঁহারা বলিলেন—'আমরা শৈশবাবধি অন্তঃপুরে আবদ্ধা আছি—শার্দ্দূল কেমন জন্তু, চক্ষে দেখি নাই—আপনি আমাদিগকে এই কক্ষমধ্যে জীবিত শার্দ্দূল প্রদর্শন করিলে, আমরা আপনার জ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারি। রাজা তৎক্ষণাৎ স্বয়ং শার্দ্দূল-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভীষণ গর্জ্জন ও লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে করিতে, তাঁহাদের নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাণীগণ প্রাণভয়ে, যিনি যেদিকে সুবিধা পাইলেন, কক্ষ ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া পলাইলেন। কিছুক্ষণ পর, রাজা স্ব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে, মহিষীগণ রাজার নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা গোপীচন্দ্র শয়ন-কক্ষে, এইরূপে মহিষীগণের নিকটে, তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিচয় প্রদান করিতেছেন,—এমন সময়ে,জলন্ধরী গুরুসিদ্ধা হাড়িফা ধ্যানে অবগত হইলেন যে, রাজা গোপীচন্দ্র, আপন মহিষীগণের নিকটে যোগ ও জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই নিমিত্ত তিনি হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া রাজার জ্ঞান হরণ করিয়া লইলেন। এদিকে মহিষীগণ, রাজার অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া আরও নানারূপ অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুরুর আজ্ঞায়,—'মহাজ্ঞান' তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া

চলিয়া গিয়াছে—শত চেষ্টা করিয়াও, শত হুঙ্কার ত্যাগ করিয়াও তাঁহার আর পূর্ব্ব ক্ষমতার স্ফূর্ত্তি হইতেছে না! অদুনা-পদুনা রাজার দুরবস্থা দর্শনে মুখে বস্ত্র দিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন—"এইবার 'যোগ' হইল না কেন? আপনি হাড়িফার বৃথা বাক্যে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত যোগের পরিবর্ত্তে 'ভোজ-বিদ্যা' শিক্ষা করিয়াছিলেন। হাড়িফা যোগসিদ্ধা নহে—সে কেবল ভোজ-বিদ্যা জানে—আপনি তাহার চাতুরীতে ভুলিয়া 'নটী'-গৃহে অনর্থক দীর্ঘকাল অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। আপনাকে সশরীরে যমালয় লইয়া যায় নাই—ভোজ-বিদ্যাপ্রভাবে মায়া সৃষ্টি করিয়াছিল মাত্র। আপনি হাড়ির সহিত ভ্রমণ করিয়া যোগের পরিবর্ত্তে নিষ্ফলা ভোজ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন মাত্র'।

মহিষীগণের নিকটে রাজার হঠাৎ জ্ঞান লুপ্ত হইলে, তিনি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইলেন—দারুণ লজ্জায় তাঁহার বদন আরক্ত হইয়া গেল। এখন তিনি তাঁহার 'জ্ঞানে'র স্থায়িত্ব ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে প্রকৃতই সন্দিহান হইলেন। এই অবস্থায় মহিষীগণের যুক্তি-তর্ক, তাঁহার নিকটে অত্যন্ত সঙ্গত বলিয়াই মনে হইল—হাড়িফার বিরুদ্ধে তাঁহাদের কল্পিত অনুযোগ যথার্থ বলিয়া প্রতীত হইল। এই নিমিত্ত তিনি শঠতার জন্য হাড়িফার উপর রাগান্বিত হইয়া অগ্নিপ্রায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং রজনী প্রভাতা হইলেই, তাঁহাকে

অথবা প্রতারণাহেতু যথারীতি শাস্তি প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

হাড়িফা, অদুনা পদুনা প্রভৃতি মহিষীবৃন্দের চক্ষুশূল—তাঁহাদের সংসারযাত্রা-পথের প্রবল কণ্টক। তাঁহার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে, তাঁহাদের সকল আপদ্-বালাই মিটিয়া যাইবে—তাঁহারা চিরজীবন পরমসুখে অতিবাহিত করিতে পারিবেন। এই নিমিত্ত, তাঁহারা হাড়িফার প্রতি রাজার ক্রোধোদ্রেকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যাহাতে তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টান্বিতা হইলেন। প্রভাতে 'বঙ্গের মহিপাল' রাজা গোপীচন্দ্র রাজসভায় 'বার দিয়া' বসিয়া আছেন—সম্মুখে কলিঙ্গ-কোটাল আদেশের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজা তাহাদিগকে, হাড়িফা যোগীকে বাঁধিয়া তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

জলন্ধরী হাড়িফা ধ্যানস্থ হইয়া রাজার আদেশ অবগত হইলেন। কিন্তু কোনরূপ আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিলেন না—প্রকাশ্যভাবে নগরমধ্যে থালাহস্তে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাজাদেশে কলিঙ্গ-কোটাল হাড়িফাকে ধৃত করিয়া রাজার সমীপে আনয়ন করিল। কিন্তু, হাড়িফা রাজসভায় প্রবেশের পূর্ব্বেই এক বধির বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। গোপীচন্দ্র, তাঁহাকে

কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু বধিরতার ভাণ করিয়া কোন কথাই শুনিল না—কেবল 'হেটমুণ্ড' হইয়া রহিল। রাজা এইনিমিত্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"হাড়ি অনেক ভোজ-বিদ্যা জানে—আমায় 'যোগ', 'জ্ঞান' বলিয়া যাহা শিক্ষা দিয়াছে, তাহা কিছুই নহে—সবই ভোজবিদ্যা সবই ফাঁকি। তদুপরি, আমায় 'নটী'-গৃহে বন্ধক রাখিয়া পূর্ণ দ্বাদশ বর্ষকাল কি কষ্টই না দিয়াছে !—"এই 'ভুতুল্যা-বেটাকে' এখনই কাটিয়া দুইখান করিয়া ফেল।" হাড়িফা, এতক্ষণ নিস্তব্ধভাবে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়াছিলেন। ধ্যানভঙ্গ হইলে, তিনি দণ্ডায়মান হইলেন—তাঁহার ঝুলি-কাঁথা দেহ হইতে স্খলিত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল। হাড়িফা বলিলেন—'রাজন্, যদি আপনার যোগতত্ত্ব শিক্ষা করিবার প্রকৃতই আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে দেশান্তরে চলুন—রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইবেন'।

হাড়িফার এই কথা শ্রবণ করিয়া অদুনা পদুনা স্থির ও নিশ্চিত রহিতে পারিলেন না। গোপীচন্দ্র কি জানি আবার পূর্ব্বের ন্যায় দেশান্তরে গমনের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠেন, এই আশঙ্কায়, তাঁহারা অনুচরগণকে আদেশ প্রদান করিলেন—'এই চণ্ডাল জলন্ধরী হাড়িফাকে এই দণ্ডেই মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত করিয়া ফেল'। রাজা নীরব রহিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদের আদেশ অনুমোদন করিলে,পরিচারক-গণ গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া হাড়িফাকে, 'হেটে কাঁটা—

উপরে কাঁটা' দিয়া প্রোথিত করিয়া ফেলিল। হাড়িফা কিন্তু মহাসিদ্ধ যোগী—গভীর গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত রহিয়াও তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল না—পরন্তু তিনি যোগস্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হাড়িফাকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়াও রাজার দারুণ ক্রোধের শান্তি হইল না। তিনি সমগ্র যোগি-সম্প্রদায়ের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, যোগিমাত্রকে দেখিলে কোনরূপ শঙ্কা বা সঙ্কোচ না করিয়া অবিলম্বেই বধ করিবার জন্য কোটালের প্রতি কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। এতদর্থে সমগ্র বঙ্গদেশে রাজার বহুতর গুপ্তচর তাহাদের সন্ধানোদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাণীগণ, এইবার হাড়িফা 'বালাই' সত্য সত্যই মরিয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্তমনে, গোপীচন্দ্রের সহিত আনন্দে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'গুরু অন্বেষণে দোঁহে করিছে ভ্রমণ।
অন্তরীক্ষে দুই চেলায় হইল মিলন॥'
'তবে গোরক্ষনাথ কন কাণুফা জুগীরে।
জলন্ধরী গাড়া আছে মাটীর ভিতরে॥'

হাড়িফা-উদ্ধার

হাড়িফা মৃত্তিকা-গহ্বরে প্রোথিত হইবার পর দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়াছে।

এই সময় একদিন অন্তরীক্ষ-পথে, গুরু গোরক্ষনাথ এবং কাণ্ফা যোগীর পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। গুরু গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কাণ্ফা হাড়িফার শিষ্য। মহাদেবীর অভিসম্পাতে মীননাথ কদলী-নগরে যোগভ্রষ্ট হইয়া কদলী-রমণীগণ-পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং হাড়িফা মেহারকুল বা পাটিকা নগরে গোপীচন্দ্র বা ময়নামতীর গৃহে হাড়িকর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়া অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু শিষ্যদ্বয় বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে পারিতেছেন না।

আজ অন্তরীক্ষ-পথে এই শিষ্যদ্বয়ের মিলন হইলে, কাণ্ফা বলিলেন—'গোরক্ষনাথ, কদলা-নগরে তোমার গুরু মীননাথ জ্ঞানহারা হইয়া মেষের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন—সেখানে সকলেই নারী, পুরুষ কেহ নাই—সত্বর গিয়া তুমি তাঁহার উদ্ধারসাধন কর।' কাণ্ফার নিকটে তাঁহার প্রার্থিত

সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গোরক্ষনাথ বলিলেন—'তোমার গুরু জলন্ধরী হাড়িফা, পাটিকা নগরে মৃত্তিকা-গহ্বরে দ্বাদশবর্ষ-কাল প্রোথিত রহিয়াছে—তুমি 'কপট' শিশুরূপ ধারণ করিয়া পাটিকা নগরে গিয়া অবিলম্বে তাঁহার উদ্ধারসাধন কর।' এইরূপে তাঁহারা উভয়ে ঈপ্সিত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় গন্তব্য স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কাণ্‌ফা শিশুরূপ ধারণ করিয়া পাটিকা নগরে প্রবেশ করিবামাত্রই, তাহাকে বিদেশী যোগী মনে করিয়া নগর-রক্ষী কোটালগণ বন্ধনপূর্ব্বক একবারে অদুনা রাণীর নিকটে উপস্থাপিত করিল। অদুনা রাণী, তাহার বন্ধন মোচন করিবার আদেশ প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ দেশে একটিও 'যোগী' প্রবেশলাভ করিতে পারে না—তবে তুমি কোন্ সাহসে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে?" শিশু কম্পান্বিতকলেবরে বলিল—'ঠাকুরাণি, আমি গুরুহীন নিতান্ত অজ্ঞ শিশু—যোগতত্ত্ব বা ধ্যানাদি আমি কিছুই অবগত নহি। আমি গৃহস্থ বালক—খেলা করিতে বাহির হইলে, এক যোগী নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া আমার হাতে মিষ্টান্ন দিয়াছিল—আমি আনন্দিতমনে তাহাই ভক্ষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু মিষ্টান্নটি উদরস্থ হইবামাত্র আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম—তদবধি, আমি আর কিছুই জানি না। আমার 'দেশ-ঘর' কোথায়, আমি এখন আর বলিতে পারি না। আপনি আমার প্রাণরক্ষা করুন এবং

আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি 'ঘরের ছেলে ঘরে' ফিরিয়া মাতাপিতার নিদারুণ শোক অপনোদন করিতে পারি।'

অদুনা, পূর্ব্বাবধি যোগি-সম্প্রদায়ের উপর অতিশয় ক্রোধান্বিতা হইয়াছিলেন; এখন এই শিশুর নিকটে তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিয়া সমধিক উত্তেজিতা হইয়া উঠিলেন। অদুনা শিশুর প্রতি মমতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করিলেন এবং "লাড়ু-কলা" ও বসন-ভূষণ প্রদান করিয়া বলিলেন—'বৎস, তুমি অনুসন্ধান করিয়া আপনার দেশে ফিরিয়া যাও। ওঃ, যোগিগণ কি নৃশংস—তাহারা এইরূপ নিঃসহায় বালক-গণকে ভুলাইয়া লইয়া কত গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়াছে!—কত মাতাপিতার একমাত্র অঞ্চলের ধন অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় মৃত করিয়া রাখিয়াছে!'

রাজা গোপীচন্দ্র, রাজ-সভায় বসিয়া আছেন। এমন সময়ে শিশু বন্ধন-মুক্ত হইয়া শূন্যপথে একবারে রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক প্রচণ্ড হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজ-সভায়, হাড়ি-সিদ্ধার অনুচর ষোলশত যোগীর আবির্ভাব হইল। যোগিগণের কর্ণে কুণ্ডল—অঙ্গে ভস্ম—স্কন্ধে ঝুলি-কন্থা! তাঁহাদের সমবেত সিংহনাদে সমগ্র পাটিকা নগর ভূমিকম্পের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল! রাজা গোপীচন্দ্র, তাঁহার সভায় অকস্মাৎ পঙ্গপালের ন্যায় এত যোগীর আবির্ভাবে

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন ! তাঁহার পাটিকা নগরে কেন, সমগ্র বঙ্গদেশেও, একজনমাত্র যোগীরও প্রবেশাধিকার নাই, তথাপি একসঙ্গে এত যোগী একবারে 'আচম্বিতে' রাজ-সভায় কোথা হইতে কোন্ পথে আগমন করিল ? রাজা গোপীচন্দ্র, ইহার কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন—'এইমাত্র আমার সভায় একটি শিশু যোগী শূন্য-পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—তাহারই যোগের প্রভাবে নিশ্চয় এত যোগীর আবির্ভাব হইয়াছে, অতএব তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি যে সিদ্ধযোগী বটেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই—আমি ইঁহারই চরণসেবা করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—'আপনারা কৃপাপূর্ব্বক আমার সৌভাগ্যবশতঃ পাটিকা নগরে পদার্পণ করিয়াছেন—আজ আপনারা এইস্থানে বিশ্রাম করিয়া ভোজনাদি সমাধা করুন—আমি যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছি।'

রাজার বাক্যে ও সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় যোগিগণ সন্তুষ্ট হইয়া ভোজনের আয়োজনাদি করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন—আজ্ঞা পাইবামাত্র রাজা নিমেষমধ্যে নানা আয়োজন করিয়া সমস্ত প্রস্তুত করিলেন। ষোলশত যোগী একসঙ্গে আহারে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদিগকে যতই দ্রব্যাদি পরিবেষণ করা যায়, তাঁহারা সমস্তই নিঃশেষে উদরস্থ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজ-ভাণ্ডার শূন্যপ্রায়

হইয়া আসিল—আতঙ্কে রাজার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। যোগিগণ রাজার অবস্থা দেখিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—'আমাদের উদর পূর্ণ হইয়াছে, আর প্রয়োজন নাই।' রাজা, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই যোগিগণ সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী, সিদ্ধকলেবর ও 'যোগে অমর' এইরূপ নির্ণয় করিয়া রাজা, কাণ্‌ফার সমক্ষে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—'আপনাদের নিকটে 'ব্রহ্মজ্ঞান' রহিয়াছে—কৃপাপূর্ব্বক আমায় কিছু জ্ঞান ভিক্ষা দিয়া অমরত্ব দান করুন—আমায় আপনার শিষ্যাধিকার প্রদান করুন।'

কাণ্‌ফা বলিলেন—'যদি, শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে গৃহবাস ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন কর—পাটিকা নগরের রাজভোগ পরিবর্জ্জন কর—অগুরু চন্দনের পরিবর্ত্তে অঙ্গে ভস্ম বিলেপন কর—মস্তক মুণ্ডন করিয়া কর্ণে কুণ্ডল পরিধান কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া গোপীচন্দ্র বলিলেন—'আমি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া হাড়িফার সহিত দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার ভোজ-বিদ্যা-প্রভাবে অশেষরূপ কষ্টপ্রাপ্ত হইয়াছি—বহু দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহার অত্যাচারের প্রতিফলস্বরূপ আজ দ্বাদশবর্ষ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছি।'

রাজা গোপীচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া কাণ্‌ফা

বিস্ময়ান্বিত হইবার ভাণ করিয়া বলিলেন—'আপনি কি অপকর্ম্মই না করিয়াছেন : জলন্ধরী হাড়িফা যোগের প্রকৃত অধিকারী—মৃত্তিকা-গহ্বরে প্রোথিত রহিলেও তিনি কখনই প্রাণত্যাগ করেন নাই—তিনি গহ্বরমধ্যে সমাধির অবস্থায় রহিয়াছেন। তিনি গহ্বর হইতে উঠিলে সমস্ত ছারখার করিয়া ফেলিবেন—এই পৃথিবীতে কোথাও পলায়ন করিয়া আপনি তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।'

কাণ্‌ফার বাক্যে বঙ্গেশ্বর গোপীচন্দ্র অতিশয় ত্রস্ত হইয়া তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন রাজাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার অবয়বের অনুরূপ তিনটি সুবর্ণ-পুত্তলি নির্ম্মাণ করাইতে বলিলেন। রাজাদেশে স্বর্ণকার গোপীচন্দ্রের তিনটি সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া আনিল। গোপীচন্দ্রের এই তিনটি সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি লইয়া কাণ্‌ফা, হাড়িফা যে স্থানে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আদেশমত, অনুচর যোগিবৃন্দ, কুদাল খনিত্র দ্বারা সেই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিল। মৃত্তিকারাশি উত্থিত হইলে, হাড়িফার সমাধি ভঙ্গ হইল। কাণ্‌ফা গোপীচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি সুবর্ণপুত্তলিসহ, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কিছুক্ষণ পর, হাড়িফা বাউল তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং কাণ্‌ফার কক্ষস্থ সুবর্ণ পুত্তলির প্রতি নেত্রপাত

করিয়া বলিলেন—'কি জন্য কে আমার সম্মুখে রহিয়াছে ?' কাণ্‌ফা যোড়হস্তে বলিলেন—'গুরুনাথ, আমি আপনার অধম শিষ্য কাণ্‌ফা গোসাঞী—আপনার জন্য কত স্থান ভ্রমণ করিয়া বহুকষ্টে এই স্থানের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি ; হাড়িফা বলিলেন—"আমি তোমায় চিনিতে পারিয়াছি ; কিন্তু, তোমার নিকটে অন্য কাহার 'ছায়া' বা প্রতিমূর্ত্তি লক্ষ্য করিতেছি—ওটি কাহার ? কাণ্‌ফা ধীরে ধীরে বলিলেন—'ওটি বঙ্গাধিকারী রাজা গোপীচন্দ্রের'। এই কথা শুনিবামাত্র হাড়িফা হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া তাহার প্রতি কোপদৃষ্টিপাত করিলেন—স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল। এইরূপে 'দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুবর্ণ-পুত্তলি ভস্মীভূত হইলে, সমবেত ষোলশত যোগী গোপীচন্দ্রের জীবন ভিক্ষা করিয়া হাড়িফার চরণ ধরিয়া লুটাইয়া পড়িল। হাড়িফা, গোপীচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করিয়া বলিলেন—'রাজন্, তুমি গৃহে গমন কর, তোমার আর কোন আশঙ্কা নাই।'

হাড়িফা এইরূপে দ্বাদশবর্ষ পাটিকা নগরে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত রহিয়া কাণ্‌ফা যোগী কর্ত্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'বাউলের সঙ্গে রাজা ভ্রমে দেশে দেশে
অমর হইল রাজা পায়্যা বহু ক্লেশ' ॥
'অতঃপর যোগেতে রহিলা জলন্ধরী।
গোবিন্দচন্দ্র আদি যত সিদ্ধা অধিকারী ॥'

দ্বিতীয় সন্ন্যাস—অমরত্ব-লাভ

হাড়িফা গোপীচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে রাজ্য-শাসন ও রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিবার আদেশ প্রদান করিলেও, তাঁহার মন আর ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হইল না। তিনি বলিলেন—'আমি রাজভোগ ও পাটিকা নগরের মায়া পরিত্যাগ করিলাম—আপনি কৃপা-পূর্ব্বক আমায় আপনার সঙ্গী করিয়া লউন—আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইব'।

হাড়িফা রাজাকে কত প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু কোনরূপে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। রাজা গোপীচন্দ্রের পুনঃ সন্ন্যাস গ্রহণের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ করিয়া ময়নামতী অত্যন্ত হর্ষান্বিতা হইলেন এবং ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য নাপিত ও সন্ন্যাস গ্রহণের দিন স্থির করিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ আহ্বান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। দৈবজ্ঞ অনতিবিলম্বে 'পাঞ্জি-পুথি' সহ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আজ মাকরী দশমী তিথি—আজ যিনি দশ দণ্ডমধ্যে

মস্তক মুণ্ডন, দ্বাদশদণ্ড মধ্যে বিভূতি বিলেপন ও ঝুলি-কন্থা ধারণ এবং ত্রয়োবিংশ দণ্ডমধ্যে কর্ণে শঙ্খ-কুণ্ডল ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তিনি অবধারিত যোগসিদ্ধা ও অমর হইবেন। সন্ন্যাস গ্রহণের এতদপেক্ষা প্রশস্ত কাল আর ঘটিতে পারে না।' দৈবজ্ঞ-ঠাকুর 'বাটীপূর্ণ' 'চাউল-কড়ি,' ময়নামতীর নিকটে বিদায় বা 'ভিক্ষা'-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

নির্দ্দিষ্টকালে নরসুন্দর স্বর্ণক্ষুরে রাজার মস্তক মুণ্ডন করিলে, তিনি কর্ণে কুণ্ডল ধারণ ও অঙ্গে ভস্ম বিলেপন করিয়া, কটিতে কৌপীন ও স্কন্ধে ঝুলি লইয়া যোগিবেশ ধারণ করিলেন। অদুনা পদুনা প্রভৃতি মহিষীবৃন্দ, রাজার অকস্মাৎ যোগিবেশ ধারণে একবারে বজ্রাহতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া রাজার চরণতলে লুটাইয়া লুটাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাতর ক্রন্দন ও বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে তাঁহারা শঙ্খ-কঙ্কণের আঘাতে ললাটদেশ রক্তাক্ত করিয়া তুলিল। গোপীচন্দ্র কিন্তু মহিষীগণের এই মর্ম্মন্তুদ কাতর ক্রন্দন ও করুণ বিলাপধ্বনি শ্রবণে আদৌ বিচলিত হইলেন না।

গোপীচন্দ্র মহিষীগণকে বলিলেন—'নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম যম সর্ব্বদা আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি গৃহে অবস্থান করিলেই, তাহার

কবলে পতিত হইব। এই নিমিত্ত আমি গৃহত্যাগ করিয়া দেশান্তরগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। তোমরা আমার মায়া পরিত্যাগ কর—তোমরা ভাবিবে, তোমাদের স্বামী গোপীচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে'। এই কথা শুনিয়া অদুনা বলিলেন—'নারী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত আছে—আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন। আপনি বসিয়া থাকিবেন—আমি ভিক্ষা মাগিয়া আপনার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিব। অতি-ভ্রমণে কাতর হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইলে সুশীতল জল দিব, বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া ব্যজন করিব'। রাজা বলিলেন—'বনে বাঘ আছে—নারী দেখিবামাত্র ধরিয়া লইবে'। অদুনা এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—'বাঘে খাইবে—সেই ভয় করিয়া কি আমি আপনার সঙ্গে বনে যাইতে পশ্চাৎপদ হইব?—রাজবধূ জানকী সুন্দরী রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করেন নাই? নারী কাহার সঙ্গে নাই?—শিবের সঙ্গে ভবানী, সুরপতির সঙ্গে কি শচী থাকেন না?—দেবতা গন্ধর্ব্ব কিন্নর সকলের মধ্যেই দেখিতে পাই—নারী ও পুরুষ এক অঙ্গ—তবে আপনি কেন আমায় পরিত্যাগ করিবেন

রাজা গোপীচন্দ্র অদুনাকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—'অদুনা, আমি গুরুর সহিত দেশান্তরে চলিয়াছি—তুমি আমার ধর্ম্ম-পথের অন্তরায়

হইও না।' অদুনা তখন হাড়িফার চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—'আপনার দুইটি পায়ে ধরি—আমাদের স্বামীকে লইয়া যাইবেন না—আমাদিগকে অনাথা করিবেন না।'

অদুনার ব্যাকুলতা দর্শনে কাণ্‌ফা ও ষোলশত যোগী সহাস্যবদনে বলিলেন—'রাজন্, আপনি পরমসুন্দরী মহিষীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেন দূরদেশভ্রমণে অশেষ দুঃখভোগ ও কষ্ট সহ্য করিবেন ? জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় রূপবতী পাটরাণী অদুনা-পদুনাকে ত্যাগ করিবেন না—আপনি গৃহে গমন করিয়া রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করুন।' গোপীচন্দ্র, তাঁহাদের এবংবিধ কথা শ্রবণ করিয়া কর্ণমূলে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'আপনারাও আমায় এইরূপ আজ্ঞা করিতেছেন' ! তদনন্তর অদুনা-পদুনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'আমি গুরু-নাম গ্রহণ করিয়া বলিতেছি—আমি আর গৃহে বাস করিব না—তোমরা আমার সর্ব্ববিধ আশা পরিত্যাগ কর।'

মহিষীগণ তথাপি নিরস্ত হইলেন না—তাঁহারা হাড়িফা ও কাণ্‌ফার প্রতি দোষারোপ করিয়া নানারূপ অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'আমাদের রাজাকে যাহারা অন্যায়রূপে পথের ভিখারী করিল, সেই নিষ্ঠুর কাণ্‌ফা চণ্ডাল মরিয়া যাউক্। আমাদের রাজাকে যিনি ফিরাইতে পারিবেন, তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য—অর্দ্ধ সিংহাসন

দান করিব—তোমরা কেহ রাজাকে ফিরাইয়া আন।' এই বলিয়া—তাঁহারা হায়-হায় করিয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অদুনার ক্রন্দনে পাষাণও বিগলিত হইতে লাগিল—নদী সাগর পর্যান্ত উথলিয়া উঠিল! বাল-বৃদ্ধনির্ব্বিশেষে নগরবাসিগণ, রাজার সন্ন্যাসবেশ ও মহিষীগণের দুরবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। হস্তিশালায় হস্তী, পিঞ্জরে শারীশুক কাঁদিতে লাগিল—দাসদাসীগণ বক্ষে করাঘাত করিয়া গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল!

অবশেষে, অদুনা সমগ্র যোগিগণের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—'আপনারা দেশান্তরে যাইবেন না—এইস্থানে অবস্থান করুন। আপনাদের সকলেরই জন্য দিব্য ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিতেছি—আপনারা এদেশে রহিয়া নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করুন।' যোগিগণ হাস্যসহকারে বলিলেন—'রাণি, আমরা পথের ভিখারী, আমরা নিয়ত যোগ চিন্তা করিয়া কালাতিপাত করি—আমাদের ঘরবাড়ী বা অন্যরূপ সুখাভিলাষের প্রয়োজন নাই'।

অদুনার শেষ চেষ্টাও নিষ্ফল হইল দেখিয়া ছয়কুড়ি রাণী সমস্বরে—'অনাথা হইলাম' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং অভিমানভরে অঙ্গের যাবতীয় আভরণ—হার-কেয়র-কঙ্কণ, নাকের বেশর, পায়ের নূপুর দূরে নিক্ষেপ

করিলেন—সীমন্তের উজ্জ্বল সিন্দুর-রেখা নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিলেন !

সকল আশা মিটিয়া গেল—তথাপি আবার চেষ্টা ! রাণীগণ নিরাভরণা হইয়া আলুলায়িতকেশে রাজার চরণ-তলে পুনরায় আসিয়া লুণ্ঠিত হইয়া, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজার সুস্থির চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল ; তিনি বলিলেন—'তোমরা অন্তঃপুরে নির্ভয়ে অবস্থান কর—আমি বৎসরান্তে একবার করিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব।'

অদুনা কিন্তু রাজার এই স্তোকবাক্যে আশ্বস্ত হইলেন না—তিনি তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন ; বলিলেন 'আমি আপনার পদযুগল ছাড়িয়া দিব না। আপনি আমাদিগকে বিদলিত করিয়া—কেমন করিয়া অগ্রসর হইবেন ?' রাজা এইবার নিতান্ত উত্ত্যক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে মাতৃসম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—'এখন হইতে নারীমাত্রই আমার জননীসদৃশ'। এ জন্মের মত তোমরা আমার আশা একবারেই পরিত্যাগ কর।' এই বলিয়া তিনি ঝাড়িকার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অদুনা-পদুনা কিন্তু, এত নিষেধাজ্ঞা, এত কঠোর দিব্য, এত প্রবোধবাক্য—কিছুতেই শান্ত হইলেন না। তাঁহারা, তাঁহার নিষেধাজ্ঞা অবহেলা করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাজা অগত্যা পশ্চাৎ

ফিরিয়া তাঁহাদের প্রতি কোপ-দৃষ্টিপাত করিয়া হুঙ্কার ত্যাগ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে অদুনা-পদুনা সেইস্থানে পাষাণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গেলেন! অপরাপর মহিষীগণ অদুনা পদুনার পরিণাম দর্শনে আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না—তাঁহারা ক্রন্দন করিতে করিতে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাজা গোপীচন্দ্র বাউল হাড়িসিদ্ধা জলন্ধরীর সঙ্গে দেশভ্রমণে বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে অমরত্ব লাভ করিলেন। রাজা গোপীচন্দ্রের ললাটে স্বভাবজাত রাজটীকা প্রকটিত—তথাপি তিনি দেশে দেশে যোগিবেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন!—বৎসরান্তে কেবল একবার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেন।

গোপীচন্দ্র চিরসন্ন্যাস গ্রহণে অমরত্ব অর্জ্জন করিলেন বলিয়া ময়নামতী তাঁহার পুত্রের দেশত্যাগে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। একমাত্র পুত্রকে স্বীয় সন্নিধানে রাজবৈভবের মধ্যে নিমগ্ন রাখিয়া, তাহার প্রাণনাশের সহায়তা করা অপেক্ষা, দূরে দূরে নানাবিধ দুঃখকষ্টের মধ্যে সন্ন্যাসাবস্থায় তাহার জীবন রক্ষা করা—তাহার সিদ্ধিলাভে ও অমরত্ব অর্জ্জনে সহায়তা করা—তিনি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। পুত্র নিকটে না রহিয়া দূর দূরান্তে থাকুক ক্ষতি নাই—বাঁচিয়া রহিলেই তিনি সুখী!

রাজা গোপীচন্দ্র, দক্ষিণ দেশে সমুদ্রতীরে অবস্থান

করিয়া কীর্ত্তন-মহোৎসবে মহানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অতঃপর জলন্ধরী সিদ্ধা হাড়িফা এবং গোপীচন্দ্র ও অপরাপর সিদ্ধা যোগিবৃন্দ যোগস্থ হইয়া 'শূন্যভরে' অবস্থান করিতে লাগিলেন।